শ্রীমৎ দাসগোস্বামী।

সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা—সেহ নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

— কৃষ্ণদাস।

শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ।
২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা;
বাগবাজার,—২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, পত্রিকা-প্রেসে,
শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌরাব্দ ৪২১।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।
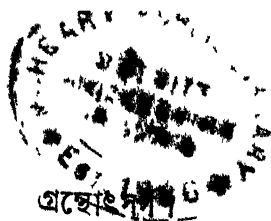
গ্রন্থোৎসর্গ

যে সকল বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর

প্রিয়তম আশ্রয়

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে

অথবা

শ্রীগোবর্দ্ধন-চরণপ্রান্তে

একান্তভাবে অবস্থিত, যাহারা অনন্যচিত্তে

ভজনতৎপর, যাঁহারা দিবসে একবারও

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর

ভুবনপাবন সুধামধুর নাম গ্রহণ করেন,

সেই সকল ভজননিষ্ঠ কৃপাসিন্ধু

বৈষ্ণব মহোদয়গণের

পরম পবিত্র নামে

এই

গ্রন্থোৎসর্গ

করা হইল।

মুখবন্ধ।

—:০:—

শ্রীমৎ দাসগোস্বামী প্রেমভক্তির পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি। তাঁহার পবিত্র-তম চরিতামৃত ভজনপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই আস্বাদ্য। শ্রীআনন্দমীমাংসা ও শ্রীস্বরূপদামোদর গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার বৈষ্ণবাচার্য্যবংশীয় ও ভজনপরায়ণ, সুতরাং তিনি এই পবিত্র চরিত-গ্রন্থনের প্রকৃত অধিকারী। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-স্মৃতি-সাহিত্য-দর্শন-অলঙ্কার প্রভৃতিতে ইঁহার পাণ্ডিত্য পণ্ডিতসমাজে অবিদিত নহে। সুতরাং এই গ্রন্থে সিদ্ধান্ত-বিরোধাদির আশঙ্কা অতি অল্প। বিবিধ শাস্ত্রে ইঁহার যথেষ্ট জ্ঞান দেখিয়া অনেক কাল হইল, ইহার অধ্যাপকগণ ইঁহাকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-স্বভাবসুলভ দীনতাবশতঃ ইনি সেই উপাধি ব্যবহারে কুণ্ঠিত, গ্রন্থকার প্রকৃত পক্ষে "গোস্বামী" হইয়াও আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত। ইহা বৈষ্ণবতারই পরিচায়ক। এই সকল গুণেই ইনি শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর চরিতামৃত গ্রন্থনের প্রকৃত অধিকারী। গ্রন্থ কেমন হইয়াছে, আমি মুখবন্ধ লিখিতে বসিয়া সে সমালোচনা করিব না। মুখবন্ধে গ্রন্থকারের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাই আমার পক্ষে অতি সুখকর কার্য্য। গ্রন্থকারের ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধেও আমি আমার নিজের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

উপসংহারে আমার এই একটি নিবেদন, ভক্তপাঠক ও সাহিত্যসেবি-গণ এই পবিত্র চরিত পাঠ করুন, দেখিবেন অধ্যয়ন-শ্রম বিফল হইবে না। অলমতি বিস্তারেণ।

পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।
১৩১৩, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ,
ঠাকুর-মহারাজের সভাপণ্ডিত।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায়

উপক্রমণিকা অধ্যায়।

—৩০—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদরের চরিত-গ্রন্থ বৈষ্ণবমণ্ডলী ও শিক্ষিত জনগণের আদরণীয় হইয়াছে, কৃপাসিন্ধু পাঠক-গণ ও সমালোচকগণ এ দীনজনকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। সেই উৎসাহে এখন শ্রীপাদ স্বরূপের একজন অতিপ্রিয় শিষ্যের চরিত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। ইনি বৈষ্ণবসমাজের চিরস্মরণীয় চির-সুহৃদ্ শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী। রঘুনাথ ভুবনমঙ্গল বিখ্যাতনামা ছয় গোস্বামীর অন্যতম, যথা:—

"জয় রূপ, সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

ইহা, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার মুখবন্ধ। পরম পূজনীয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষেই এই ভুবনপাবন নামের উল্লেখ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বীয় মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করেন। দাস গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপের অতি-প্রিয়-পাত্র। শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুর শেষ-লীলার নিগূঢ় মর্ম্ম ইহাকে অব-গত করাইয়াছিলেন। দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে সেই গম্ভীর লীলা শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কবিরাজ উহার বর্ণন করেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে:—

চৈতন্য লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণ দিল এই ভেটে ॥
মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ত্য লীলাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক প্রধান বিশিষ্টতা। এই লীলা প্রেমবারিধির দুরবগাহ মহাভাবের মহোচ্ছ্বাস। ইহা অতীব দুর্ব্বোধ্য, ভাষায় ইহার অভিব্যক্তি আদৌ অসম্ভব কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন।—

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব-গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥

এই দুর্গম দুরবগাহ লীলা সাম্রাজ্যে শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ রঘুনাথ গোস্বামী, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসের পথ-প্রদর্শক। কেননা, অন্যান্য কড়চা গ্রন্থে এই লীলার বিবরণ আলোচিত হয় নাই। কেবল শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চাতেই এই ভাব-গম্ভীর মহা-লীলা জগতে প্রকাশ পাইয়াছেন। অন্যান্য কড়চা-কর্ত্তারা তখন দূর দেশে ছিলেন, তাঁহাদের কড়চাতে এই লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইয়ের কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ।
সেই কালে এই দুই রহে প্রভু পাশে।
আর সব কড়চা কর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভাবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্র কর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তাহার বাহুল্যে বর্ণি পঞ্জি টীকা ব্যবহার ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীমদ্ দাসরঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর শেষ-লীলার রসাস্বাদ উপভোগ পূর্ণরূপেই করিয়াছিলেন। ইহা অপরের

সুদুর্লভ। শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুর অতীব প্রিয় সহচররূপে কি ভাবে অবস্থান করিতেন, তাহার কিছু কিছু বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা :—

সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর স্বরূপের সমান কেহ নয়॥

শেষ লীলাতে শ্রীপাদ স্বরূপই মহাপ্রভুর নিত্যসহচর ছিলেন। স্বরূপ সতত মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন—

দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাস পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
অহনিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
বিহরেন দামোদর স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম নিত্যসহচর শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কড়চা, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কড়চা ও তদীয় শ্রীমুখের উপদেশামৃত হইতে সংগ্রহ করিয়াই যে শ্রীল কবিরাজ শেষ লীলা বর্ণন করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার নিজ লিখিত প্রমাণে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

ফলতঃ মহাপ্রভুর মহাবিরহের মহাভাবময়ী শেষলীলায় শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রায় রামানন্দ ভিন্ন অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। যদি অপর কেহ তাহা জানিয়া বা বুঝিয়া থাকেন, শ্রীপাদ স্বরূপের কৃপাই

তাহার মূল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে সেঁহ তাহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞীর তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥

ফলতঃ শ্রীপাদ স্বরূপের কৃপায় রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই দুরবগাহ ভাবগম্ভীর মহালীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহারই শ্রীমুখে এই প্রেমরস-তত্ত্বময়ী মহাগম্ভীর লীলার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তাই তিনি লিখিয়াছেন :—

তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভজনপ্রণালীর সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর। শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট হইতে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ভজনতত্ত্ব লাভ করেন, তৎপরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উহা জগতে প্রচারিত করেন।

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীমদ্ রঘুনাথের শিক্ষাগুরু। ইঁহার দীক্ষা-গুরু প্রেমবান্ শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য, যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে :—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়।
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং॥
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো।
বৈরাগ্যৈকনিধি র্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

অর্থাৎ শ্রীবাসুদেবের প্রিয়তম প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য বিবিধ গুণের নিদান রঘুনাথ দাস আমাদের প্রাণাধিক। নীলাচলস্থিত জনগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাস্নিগ্ধ, স্বরূপ-দামোদরের নিরতিশয় প্রিয় ও বৈরাগ্যের সাগর সেই রঘুনাথ দাসকে না জানেন? অপিচ—

যঃ সর্ব্বলোকৈক মনোহভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্ট পচ্যা।

যস্তাং সমারোপণ তুল্যকালং
তৎপ্রেম শাখী ফলকাল তুল্যম্ ॥

হা শ্রীল শিবানন্দ সেন মহাশয়ের উক্তি। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসের অন্বেষণে তাঁহার পিতা নীলাচলে লোক প্রেরণ করিলে সেই লোকের প্রশ্নোত্তরে শ্রীল শিবানন্দ প্রাগুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ যখন নীলাচলে একান্ত ভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন মহাপ্রভু ইঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥

আদ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ।

অপিচ— স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণেব তিঁহো হয় প্রাণসম ॥

অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৈরাগ্যের প্রকটমূর্ত্তি এবং প্রেমভক্তির মহাসাগর। শ্রীপাদ স্বরূপের এই ভুবনপাবন প্রিয়তম শিষ্যের প্রেম-ভক্তিপ্রদ অমিয় চরিত্র-গঠন,—শ্রীল স্বরূপ-দামোদরেরই কৃপামাহাত্ম্যের পরিচায়ক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উপযুক্ত গুরুর নিকটেই উপযুক্ত শিষ্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপের প্রেমভক্তিময়ী লীলা-কাহিনী বর্ণনার পরে বৈরাগ্যনিষ্ঠাময় তদীয় প্রেমিক ভক্ত শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর চবিতামৃত বর্ণন অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া এই ভুবনপাবন চরিত্রের কণামাত্র স্পর্শ করিতে দুঃসাহসী হইলাম।

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের চরিতামৃতের সহিত শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিতামৃত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শ্রীল রঘুনাথ স্বরূপের প্রিয়তম শিষ্য, সহচর, অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, এমন কি "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই পরিচিত। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে আরও কতিপয় রঘুনাথের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একজন পূজ্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ ভট্ট। বন্দনায় ইনিই ভট্ট রঘুনাথ বলিয়া প্রখ্যাত। অপর—

বৈদ্য রঘুনাথ। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথপুরী, রঘুনাথ তীর্থ ও দ্বিজ রঘুনাথ নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন দাস রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় লাভের আশায় তদীয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু এই একান্ত অন্তরঙ্গ, পরম স্নেহাস্পদ ভক্তের হাতে ধরিয়া ইঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট সমর্পণ করেন এবং "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই অভিহিত করেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে —

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হৈঞা॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈতে ইহার নামে॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তারে দিল সমর্পিয়া॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল॥

শ্রীপাদ স্বরূপের সহিত রঘুনাথের কি সম্বন্ধ, এস্থলে অতি স্পষ্ট-রূপেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু তাঁহার "দ্বিতীয় স্বরূপ"কে বলি-তেছেন, "এই রঘুনাথকে আজি আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। রঘুনাথ আমার বড় প্রিয়, তুমি ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিও, রঘু তোমাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে, এবং ভৃত্যের ন্যায় তোমার সেবা করিবে। এ বস্তুটী আজ হইতে তোমার হইল, আজ হইতে এই রঘুনাথ "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে সকলের নিকট পরিচিত হইবে।" এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথের হাতে ধরিয়া উহাঁকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহা-কেই বলে "হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়া।"

দান কাহাকে বলে? স্বস্বত্বধ্বংসপরস্বত্বোৎপত্তিফলক ত্যাগের" নাম দান। রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। রঘুনাথ তখন মহা-

প্রভুর নিজ বস্তু হইলেন। যাহাতে যাঁহার স্বত্ব নাই, তিনি তাহার দান বিক্রয়ের অধিকারী নহেন। রঘুনাথ জগতের সমস্ত ভোগ সুখাদি পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রিয়তম ভক্তরত্নকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিয়া বলেন, "স্বরূপ আমার এই প্রিয়বস্তু আজ হইতে তোমার হইল, তুমি ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিও। ইহাকে ভৃত্য মনে করিও, ইহার সেবা গ্রহণ করিও। শ্রীপাদ স্বরূপ "যে আজ্ঞা" বলিয়া শ্রীরঘুনাথকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ সন্ন্যাসী। আজ প্রভুর আজ্ঞায় আকুমার সন্ন্যাসী স্বরূপদামোদর একটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিয়াই, ভক্তসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতাও গুরু-শিষ্য উভয়ের স্মৃতিসূচক এই পবিত্র মধুর নামের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"স্বরূপের রঘুনাথে" দর্শন না পাঞা।
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইয়া॥

শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে মহাপ্রভু যে শ্রীমদ রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, রঘুনাথ স্বরচিত "কৃষ্ণচৈতন্য কল্পবৃক্ষ" নামক স্তোত্রে তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যথা :—

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অর্থাৎ যিনি এ হেন পতিত কুজনকে মহাসম্পত্তি রূপ দাবানল হইতে কৃপাগুণে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয় স্বরূপ শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, অপিচ বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এইরূপে অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন :—

কৃপাগুণৈর্যঃ গৃহান্ধকূপা
দুদ্ধৃতা ভঙ্গ্যা রঘুনাথ দাসম্।
ন্যস্ত স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহং প্রপদ্যে॥

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর রঘুনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। রঘুনাথও স্বরূপকে পিতৃরূপে ও শিক্ষাগুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতীব যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীকে বলিয়া দিলেন, "শ্রীপাদ স্বরূপই তোমার শিক্ষাগুরু। তাঁহার নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা করিও। এই সকল তত্ত্ব স্বরূপ যেমন জানেন, আমিও তেমন জানি না।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইহ যত জানে।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসের ভজন কিরূপ, স্বরূপ ও রায় রামানন্দ দ্বারাই প্রভু তাহা জগতে প্রচার করেন। ভক্তমহিমা প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু অদ্বিতীয়। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

ভক্তি মহিমা বাড়াইতে ভক্ত, সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে।

আরও এক কথা এই যে, তাঁহার যে ভক্ত দ্বারা তিনি যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্টতা আছে। ব্রজের মধুর রসের ভজনতত্ত্বে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের বিশিষ্টতাই সূচিত হইয়াছে। প্রভু স্বয়ং বলিতেছেন "আমি তত নাহি জানি ইহঁ যত জানে।" অন্যত্রও

ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বল্লভ ভট্টের অভিমান দূরীকরণের জন্য প্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তখনও শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন "ইঁহার নিকটেই আমি ব্রজের মধুর রসের জ্ঞানলাভ করিয়াছি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে :—

দামোদর-স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রসের জ্ঞান॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ হীন।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥ (১)
গোপীগণের শুদ্ধ ভাব ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন॥ (২)
সর্ব্বোত্তম ভজন ইঁহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী॥ (৩)
ঐশ্বর্য্য ভাব হৈতে কেবল ভাব প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান॥

(১) যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু,
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।

(২) পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃ বান্ধবান্
অতি বিলঙ্ঘ্যতেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ ক স্ত্যজেন্নিশি।

(৩) ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

তিঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন। (৪)
স্বরূপের সঙ্গে পাইনু এ সব শিক্ষণ॥

এই যে সারগর্ভ ভজনতত্ত্বের উল্লেখ করা হইল ইহাই ব্রজের মধুর রসের ভজন। বৈরাগ্য অন্তে প্রেম ভক্তির সবিশেষ স্ফূর্ত্তিতেই এই ভজনে অধিকার জন্মে। এই ভজনের অপর নাম "অন্তরঙ্গ সেবা" বা "গুপ্ত সেবা"। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের নিকটেই এই মধুর ব্রজরসের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে :—

প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইল বৃন্দাবন॥

পাঠক মহোদয়, এখন মনে করুন, যিনি মহাপ্রভু দ্বারা শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের হস্তে ন্যস্ত হইয়া ভজনসাধন-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীপাদ যাহাকে স্বরূপদামোদরের সহিত পুত্রবৎ-ভৃত্যবৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া দিলেন, যিনি ষোড়শ বর্ষকাল তাঁহার সহিত অনবচ্ছিন্নভাবে অন্তরঙ্গ ভজন করিলেন,—শ্রীপাদ স্বরূপের পুত্রতুল্য এমন প্রিয়তম শিষ্য নিয়তানুচর এবং সহচর শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিতামৃত আলোচনা করা কত অধিক প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভবেই যে শ্রীমদ্ দাসগোস্বামীর চরিতামৃত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা নহে। কেন না, সে যোগ্যতা আমার নাই। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের শিক্ষা-জনিত শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর চরিত্র-বিকাশ,—নীলা

(৪) আসামহো চরণরেণু যুষামহং স্যাং।
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম॥
যা দুস্ত্যজং স্বজন আর্য্য পথঞ্চ হিত্বা।
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
বন্দে নন্দব্রজ স্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন ত্রয়ম্॥

চরলীলার এক গূঢ় রহস্য ব্যাপার। সাধারণ জ্ঞানে ইহার ধারণা অসম্ভব। গুরুকৃপা ভিন্ন ইহা বুঝা অসম্ভব, লৌকিক ভাষায় উহার অভিব্যক্তি তো একবারেই দুর্ঘট। এ দীনজনের উদ্দেশ্য,—কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করা,—কেবল তাঁহার নাম করিয়া আত্মশোধন করা, সুতরাং এই পরম পবিত্র চরিত্রের কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতে পারিব, এই মনে করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা কেবল বৈষ্ণব-কৃপা।

চরিত্রবর্ণন কার্য্য স্বভাবতঃই অতীব গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণা, সূক্ষ্ম-বিচার, লিপিচাতুর্য্য এবং সর্ব্বোপরি বর্ণনীয় চরিত্র সম্বন্ধে প্রগাঢ় ধ্যানের প্রয়োজন। দেশের তাৎকালিক নৈসর্গিক বিবরণ, সামাজিক ইতিহাস, বর্ণনীয় ব্যক্তির বংশচরিত এবং তদীয় জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করা চরিতাখ্যায়কের প্রথম কার্য্য। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানও বহিরঙ্গ। বর্ণনীয় ব্যক্তির জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য কি, পারিপার্শ্বিক অপর কোন্ চরিতের প্রভাবে তদীয় জীবন বিকাশলাভ করে, কোন্ কোন্ প্রতিকূল অবস্থা ভেদ করিয়া বর্ণনীয় ব্যক্তির চরিত্রবল প্রকটিত হয়, কোন্ কোন্ প্রধান গুণে তাঁহার চরিত্র মানব-সমাজের চরিত্রোন্নতির পথপ্রদর্শন করে, এবং তাঁহার কোন্ মহিমাতেই বা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজ তাঁহার শ্রীচরণচিহ্নের অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হয়—এই সকল বিবরণ বিশদরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলাই চরিতাখ্যায়কের প্রধানতম কঠিন কার্য্য, এবং ইহাই জীবনী লেখকের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই প্রধানতম উদ্দেশ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াই এ দেশবাসীরা চরিতাখ্যান লিপিবদ্ধ করিতেন।

যেরূপ ভাবেই যে চরিত্র বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, পদে পদেই উহার কাঠিন্য অনুভূত হইবে। কিন্তু ভক্তচরিত বর্ণনা করা আবার আরও দুরূহ ব্যাপার। ভক্তি মানব হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাবৃত্তি। এই বৃত্তির উন্মেষে মানুষের আত্মা জড়াতীত শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, মানুষ তখন ভক্ত চিনিতে পারে, ভক্তের ভাব বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং ভক্তচরিত সাহায্যে ভক্তিরাজ্য প্রবেশ করে।

নিজের হৃদয়কে পূর্ণরূপে ভক্তিভাবে পরিপ্লুত করিয়া না তুলিতে পারিলে, পূর্ণরূপে তদ্ভাবভাবিত না হইলে কোনও ক্রমে বর্ণনীয় চরিতে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না। আবেশ ও প্রবেশ ভিন্ন চরিতাখ্যান অসম্ভব। আবেশ প্রগাঢ় ধ্যানের ফল, প্রগাঢ় ধ্যান আবার কঠোর সাধনালভ্য। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী ভজনের আদর্শ। জগতের যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি শ্রীমদ্দাস গোস্বামী মহানুভাবকে পার মার্থিক গুরুর পদে বরণ করিয়া কৃথার্থ হইতে পারেন। এতাদৃশ আদর্শ মহাপুরুষের পুণ্যচরিত বর্ণনা করা মাদৃশ ভজনবিহীন অভাজনের কার্য্য-রূপে পরিগণিত হইতে পারে না, তাহা আমি ভালরূপেই জানি। কিন্তু মনোরথের অগম্য স্থান নাই। লোভাকৃষ্ট চিত্তেরও বিচার বুদ্ধি থাকে না। তাই এই দুষ্প্রয়াস।

পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীচরিতামৃতে যেরূপ অল্পাক্ষরে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চরিত্র প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের অন্যান্য গ্রন্থে এইরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ও পরিস্ফুট বর্ণন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই চরিত্র বর্ণনের উপযুক্ত পাত্র। শ্রীল কবিরাজ শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র, সুতরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাসুধায় পূর্ণরূপেই অভিষিক্ত। ইনি ইঁহার ভক্তিময় জীবনের অধিকাংশ সময়ই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীচরণান্তিকে থাকিয়া অতিবাহিত করিতেন, অনুক্ষণ তাহার পদারবিন্দ সন্দর্শন করিতেন, স্বীয় কর্ণে তাহার শ্রীমুখের উপদেশ গ্রহণ করিতেন, স্বীয় নয়নযুগলে অহর্নিশ তাঁহার ভজনমুদ্রা সন্দর্শন করিতেন। বলিতে কি শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সাধন রীতি দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীল কৃষ্ণদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চরিতসুধার সারস্বরূপ।

রঘুনাথ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিলাসনিকেতনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ এক মুহূর্ত্তও তাঁহার চিত্ত বিলাসসুখসম্ভোগে ধাবিত হয় নাই। তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় শৈশব হইতেই ভগবদ্ভক্ত, কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অতি অল্প

বয়সে বিষয় কার্য্যেও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মে। কুচক্রী তুড়ুকের প্ররোচনায় বাদসাহ যখন রঘুনাথের জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাস ও পিতা গোবর্দ্ধন দাসকে ধৃত করার জন্য উজির পাঠাইলেন, তখন তাঁহারা অপমান ভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ নির্ভীকভাবে বহিঃপ্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যবনসেনা সহ উজির হিরণ্য দাসের আলয়ে প্রবেশ করিল। হিরণ্য দাস গোবর্দ্ধন দাসকে না পাইয়া বালক রঘু-নাথকেই বাঁধিয়া লইয়া কারাগারে আবদ্ধ করিল, এবং উহাঁর পিতা ও পিতৃব্যকে হাজির করার নিমিত্ত তাড়না করিতে লাগিল। কিন্তু রঘুনাথ তখন অটল ও অচলভাবে সকল প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন সহ্য করিলেন। রঘুনাথ তখন বিনয় নীতি অবলম্বন করিয়া সেই তুড়ুককে বলিলেন, "আপনি পালক আমি পাল্য, আপনি পিতৃতুল্য, আমার প্রতি অত্যা-চার করিতে কি আপনার ক্লেশ হয় না?" রঘুনাথের এই দীন-বচনে ম্লেচ্ছের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। তিনি উজিরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্তি দিলেন। ইহা বিষয় বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু রঘুনাথের বুদ্ধি আশৈশব ভক্তিবিহ্বলা। তাঁহার বাল্যজীবনেই নামাবতার শ্রীমৎ হরি-দাস ঠাকুর তাঁহার প্রতি কৃপা করেন। যিনি বার্ষিক বিশ লক্ষ মুদ্রার আয়বিশিষ্ট বিষয়ের ভাবীকর্ত্তা, শৈশবেই হরিনাম তাঁহার এক মাত্র প্রীতির পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়েন। তাঁহার শৈশবজীবন হইতেই বিষয়-বৈরাগ্যের বহু চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার আবির্ভাবের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরশশী উদিত হয়েন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে গোরাশশীর সুধামাখা প্রেমভক্তির কিরণরাশি চতুর্দ্দিকে বিসারিত হইয়া পড়ে।

রঘুনাথের হৃদয়তটিনী কুলুকুলু-কলকল নিনাদে অজ্ঞাতভাবে যেন কাহার কোন্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উধাওভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাকিরণ সহসা এক দিবস রঘুনাথের হৃদয়ে আপতিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল, রঘুনাথের চিত্ত এবার একবারেই উদাস হইয়া উঠিল, ভাগ্যক্রমে শুভমুহূর্ত্তে একদিন তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে সন্দর্শন করিলেন, চিনিয়া লইলেন, এবং সেই দিন হইতে

সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গচরণ লাভই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হউক। এই সঙ্কল্প অবিচলিত রহিল। রঘুনাথের বিষয়বৈরাগ্য দেখিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন, বিষয়-ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘু উহাতে আকৃষ্ট হইলেন না। অবশেষে অভিভাবকগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, কিন্তু পারমার্থিক জীবনের সারধন শ্রীগৌরাঙ্গচরণ লাভের জন্য এক দিবস উষকালে "জয় গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া রঘু বাটী হইতে চিরদিনের তরে পলায়ন করিলেন। যদিও তিনি ইতঃপূর্ব্বে আরও একবার এইরূপ অজ্ঞাতভাবে বাটী হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার শুভদিন সমাগত হয় নাই মনে করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে পুনরায় প্রত্যাগমনের আদেশ করেন। এবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে আর বাধা দিলেন না।

পুরুষোত্তমধামে এই বিশাল বৈভবের ভাবী অধীশ্বর যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া এবং কঠোর নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করিয়া সাধক জীবগণকে নির্ম্মল প্রেমলাভার্থ আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শন করেন, তাহা দেখিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া উপক্রমণিকার উপসংহার করিতেছি ঃ—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায়, যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সেহ নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না কৈল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছেড়া কাণি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেন করয়ে ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনা করে নির্বেদ বচন॥

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হলে ভাত সরি যায়॥
সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভী আগে ডারে।
সড়াগন্ধ তেলেঙ্গা গাভী খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পাণি॥
ভিতরের দড় ভাত মজি যাহা পায়।
লুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর রঘুনাথের পারমার্থিক জীবনতরীর কর্ণধাররূপে নিযুক্ত হয়েন, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে এই আদর্শ ভজনচরিত গঠিত হয়েন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের পরে শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে তিনি রাগানুগভজনের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা সাধক মাত্রেরই আদর্শ স্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরিণাম॥
রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেই নহে কোন দিনে॥

এইরূপ ভজন সাধন প্রকর্ষে কায়স্থকুলভাস্কর শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস "গোস্বামী" নামে অভিহিত ও আদৃত হয়েন। অপর পাঁচ গোস্বামী জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও শ্রীমৎ রঘুনাথের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন :—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপকং।
গোপাল রঘুনাথস্ত ব্রজবল্লভ পাহিমাম্।

তিনি ইহার স্বয়ং যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে 'হে শ্রীরঘুনাথ দাস নামধামতয়া ইতি প্রসিদ্ধ পরমভক্তিপরাবিদ্ধঃ।'

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ মহোদয় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

ভক্তে বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা,
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপাল ভট্টো রঘুনাথ দাসং
সন্তোষয়ন্ রূপ সনাতনৌচ॥

ইহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন "শ্রীরঘুনাথ দাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করং পরমভাগবতঃ" ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন :—

রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টো
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসো।
প্রাতামুভৌ যত্র সুহৃৎ সহায়ৌ
কো নাম সোঽর্থো ন ভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥

ভজনরাজ্যে রঘুনাথের আসন অতি উচ্চতম। বলিতে কি, রঘুনাথ সমগ্র জগতের ভজনগুরু। ইহার ন্যায় ভজন-আদর্শ মহাপুরুষ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসের চরিত পাঠে মানব-সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হয়, সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি লাভের নিমিত্ত চিত্তে বলবতী বাসনার উদ্রেক হয়। এই অত্যুজ্জ্বল চরিতবর্ণন-প্রয়াস আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র। পরম কৃপালু বৈষ্ণব-পাঠকগণ এ দীনজনের এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার ভরসা।

শ্রীমৎ দাসগোস্বামী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন সপ্তগ্রাম।

বিলাসবৈভবের কোমল ক্রোড়ে বৈরাগ্যের প্রকটমূর্ত্তি জগতের পক্ষে এক অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে সকল পারমার্থিক শিক্ষাগুরু ঐশ্বর্য্যের লীলাবিলাসময় বক্ষে লালিত পালিত হইয়াও অলৌকিক বৈরাগ্যব্রতাচারণনিষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠানে জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছেন, মোহাভিভূত মানব-হৃদয়ের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জগতে উত্তোলিত করিয়াছেন, শ্রীমৎ দাস রঘুনাথ তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস বৈরাগ্য ও মধুর ভজনের পূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শ মহাপুরুষ শৈশবে ও বাল্যে কি প্রকার ঐশ্বর্য্য-বিলাসের কোমল কোলে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন, অনন্ত বৈভবের অধিপতি হইয়াও বিলাসবাসনার প্রণোদনায় ও প্ররোচনায়, ইঙ্গিতে ও আহ্বানে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া কি প্রকারে বৈরাগ্যের কঠোর কণ্টকিত ভূমির উপর দিয়া মধুরোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠতম ভজনরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সংসারাশ্রমের অবস্থার তথ্যানুসন্ধান একান্ত কর্ত্তব্য। রজতশুভ্র পূর্ণিমানিশির মনোমদ মাধুর্য্যের পূর্ণানুভব করিতে হইলে মেঘমেচর অমানিশির প্রগাঢ় অন্ধকারের পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত একটুকু তুলনা করা প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য-সিন্ধুর বিন্দু-

মাত্র পরিমাণ করিতে প্রয়াসী হইলে, প্রথমেই তাঁহার বিপুল পার্থিব বৈভব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায়, শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর পিতা ও পিতৃ-জ্যেষ্ঠ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের সহিত বঙ্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবিধভাবে বিজড়িত। সপ্তগ্রামের প্রাচীন তত্ত্ব বলিতে গেলেই সরস্বতী নদীর প্রভাব-প্রতিপত্তির ইতিবৃত্ত ইতিহাস পাঠকগণের স্মৃতিপথে প্রথমতঃ উদিত হয়। সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, সরস্বতীর স্মৃতিরেখা এখনও বিরাজমানা। কিন্তু সরস্বতীর আর সে তরঙ্গ নাই, সে বিপুল বিস্তার নাই। এই সরস্বতীর বক্ষে খ্রীষ্টীয় ষোল শতাব্দীর পূর্ব্বে রোম পর্টুগীজ ও ইয়োরোপের অন্যান্য প্রদেশের বণিকগণের বাণিজ্যতরি প্রতিনিয়ত বিরাজ করিত। পুরাণে এই সরস্বতী পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রয়াগ, গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলী। সরস্বতী কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে ত্রিবেণীঘাটে গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগ করিয়া ত্রিবেণীর পশ্চিম দক্ষিণাংশের জনপদ সকল পবিত্র করিবার জন্যই যেন প্রধাবিত হইয়াছিলেন। গঙ্গা সরস্বতীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার প্রবল ধারা সরস্বতীর সহচারিণী হইলেন। সরস্বতী বক্রগতিতে হুগলীর দক্ষিণ ও হাবড়ায় কতক অংশ পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান উদ্ভিদ (বোটানিক্যাল) বাগানের পার্শ্ব দিয়া পুনরায় গঙ্গাসহ মিলিতা হয়েন। এখনও ত্রিবেণীর দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া সরস্বতী-খাদের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। হাবড়ার অন্তর্গত আমতা ও সাঁকরাইলের নিম্নে এখনও সরস্বতী বক্ষে নৌকা যাতায়াত করে। কিন্তু এখন সরস্বতীর সেই বিপুল প্রভাব কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র।

এই সরস্বতীর তীরেই সপ্তগ্রাম। পৌরাণিক সময় হইতেই সপ্ত গ্রামের প্রসিদ্ধি। ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেশন কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূরে। সপ্তগ্রাম ইহার অতি নিকটবর্ত্তী। পৌরাণিক প্রসঙ্গ এই যে কান্যকুব্জাধিপতি প্রিয়বন্তের সাত পুত্র এই নদীতীরে সাতটী গ্রাম শাসন করিতেন। এই গ্রামগুলি সমষ্টিভাবে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়

ইঁহারা ঋষি ছিলেন। ইঁহাদের শাপ বশতঃই নাকি সপ্তগ্রামে কুশ জন্মে না। হাণ্টার সাহেবের "ষ্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল" নামক গ্রন্থেও এই পৌরাণিক বিবরণের উল্লেখ আছে।(১) মুসলমান নৃপতিদের সময়ে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না। এই সময়ের সপ্তগ্রাম রাজকীয় বন্দর বা Royl port নামে অভিহিত হইত।(২) এখন যেমন কলিকাতা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, পূর্ব্বে সপ্তগ্রামও সেইরূপ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সপ্তগ্রাম রাজধানী, বাণিজ্যস্থলী ও তীর্থস্থলী বলিয়া সমাদৃত হইত।

রোমদেশীয় বণিকেরা সপ্তগ্রামকে (1 g s • নামে উল্লেখ করিতেন।(৩) সপ্তগ্রামের সেই সময়ের সমৃদ্ধি অনেক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে বিবৃত আছে। সপ্তগ্রাম সহর অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন যেমন কলিকাতায় ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য দেশবাসী সওদাগরগণ বসবাস করিতেছেন, সেই সময়ে সপ্তগ্রামেও ইয়োরোপীয় ও অপর দেশীয় সদাগরেরা অবস্থান করিতেন।(৪) শ্রীচৈতন্য ভাগবতে সপ্তগ্রামের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে:—

কতদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সঙ্গে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান। (৫)
জগতে বিদিত যে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥

---

(1) vide Hunter's Statistical account of Bengal vol III P. 300

(2) vide Indian companion P. 154.

(3) vide Asiatic Researches vol 9 278.

(4) Major Renal's memoir of the map of Hindoostan.

(৫) হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন :—
Prieyabasta King of Kanuj had seven sons who were reshis and who lived in Satgaon and whose names are given to seven villages viz Agnidra, Romanka, Bhas-isantic, sovranana, Bara, Sanan and Duti-mant.

সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে॥

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলী ত্রিবেণী হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থলী। উড়িষ্যার গজপতি বংশীয় রাজা মুকুন্দদেব ত্রিবেণীর ঘাট বান্ধিয়া দিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিবেণীতে গমন করেন, তখন ত্রিবেণী শিক্ষা-সমাজের কেন্দ্র বলিয়া সম্মানিত হইত। এই সময়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী এই চারি স্থলে সংস্কৃত শাস্ত্রের শিক্ষা-সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক ত্রিবেণীতেই তখন ত্রিশটী সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল। মকর সংক্রান্তি, বিষ্ণু সংক্রান্তি, বারুণী, দশহরা ও কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে ত্রিবেণীতে বিপুল মেলা হইত। (৬) মুসলমান রাজত্বের সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের রাজধানরূপে পরিগণিত হয়। এখানে মুদ্রাদি প্রস্তুত হইত। (৭) সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তারা প্রায়শঃ ভারত সম্রাটকে গ্রাহ্য করিতেন না। এই কারণে আকবরের রাজত্ব সময়েও "বুলাক্" অর্থাৎ বিদ্রোহীদের স্থান বলিয়া সম্রাটের সরকারে এই স্থলের দুর্নাম ছিল। (৮) ফলতঃ স্থানীয় মুসলমানশাসনকর্ত্তারাই সপ্তগ্রামের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন।

এই সময়ে এই অঞ্চলে এক ক্ষমতাশালী ও বিপুল বৈভবশালী হিন্দু

---

(6) Vide Indian Companion 61.

(৭) এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় লিখিত আছে :—
In the early period of the Mahomedan rule Satgaon was the seat of the governors of lower Bengal and mint-town.

(8) The Afgans again rebelled Etc. Stewart's History of Bengal.

পরিবারের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। এই বংশে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। রাজকার্য্যে ইঁহারা অচিরেই বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। মুসলমানদের অত্যাচার হিন্দুদের বড় ক্লেশের কারণ হইতেছে দেখিয়া ইঁহারা সপ্তগ্রামের শাসন কর্তৃত্ব মোক্তাসূত্রে গ্রহণ করেন। "মোক্তা" কতকটা ইজারা বন্দোবস্তের মত। মোক্তার অর্থ এই যে প্রতি সন রাজসরকারে নির্দ্দিষ্ট একটা অঙ্ক জমা দেওয়া হইত, রাজসরকারের সহিত কেবল এই নির্দ্দিষ্ট জমার সম্বন্ধ থাকিত। মোক্তা বন্দোবস্তদার মহাল হইতে সদর জমার অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় তহশীল করিতেন, তাহার সহিত রাজসরকারের কোন সংস্রব থাকিত না। মোক্তা বন্দোবস্তদারীকে কোন হিসাব নিকাশও দিতে হইত না। ইঁহারা মোটামোটি একটা বড় দায়হ নিষ্কৃতি পাইতেন। অথচ নিজেরা প্রচুর পরিমাণে কর সংগ্রহ করিয়া লাভবান্ হইতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জনক, জ্যেষ্ঠতাত ও বিষয়বৈভব।

বলা বাহুল্য রাজসরকারে উঁহাদের মোক্তা প্রস্তাব সহজেই গ্রাহ্য হইল। সপ্তগ্রামের মুসলমান চৌধুরীরা সদরের জমা কিছুমাত্র প্রদান না করিয়া মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইতেন। এ অবস্থায় হিরণ্য গোবর্দ্ধন প্রতি সন একটা মোক্তা জমা নিয়মিতরূপে দিলে তাহা অবশ্যই লাভের কারণ। সুতরাং বাদসাহের সরকারে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ইঁহারা বার লক্ষ টাকা বাৎসরিক মোক্তা জমা স্থির করিয়া সপ্তগ্রামের মজুমদার হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

——মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয়ত চৌধুরী।

হিরণ্য দাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেয় রাজারে, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাইয়া হইল প্রতিপক্ষ॥
অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার অন্যত্র লিখিত আছে :—

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই, মুলুকের মজুমদার।"

সদরের কাগজ পত্রে সপ্তগ্রাম বলিলে কেবল সাতগ্রামের সমাহার বুঝাইত না। সপ্তগ্রাম মুলুক অতি বিস্তৃত ছিল। পরগণা অপেক্ষাও মুলুক অধিকতর বিস্তৃত। অনেকগুলি পরগণার সমাহারে এক মুলুক। এই জন্য চলিত কথাতে লোকে "এক রাজার মুলুক" এইরূপ শব্দ ব্যবহার করে। হাণ্টার সাহেব তাঁহার ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, আকবরের সময়ে রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সেরেস্তায় সপ্তগ্রাম একটী রাজস্বসরকারে ভুক্ত ছিল। সেই সেরেস্তায় "সরকার সপ্তগ্রাম" নামে সপ্তগ্রাম মুলুক অভিহিত হইত। হুগলী হাওড়া চব্বিশ পরগণা কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ এই "সপ্তগ্রাম সরকারের" অধিকারভুক্ত ছিল। (৯)

হিরণ্য গোবর্দ্ধন কেমন বিপুল বৈভবের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইতে পারে। ইঁহারা বারলক্ষ টাকা মোক্তা সদর জমা দিতেন। কিন্তু সরকার সপ্তগ্রাম হইতে ইঁহারা আদায় করিতেন ২০ লক্ষ টাকা। সুতরাং সদর জমা ব্যতীত ইঁহারা আট লক্ষ টাকা লাভ করিতেন।

(9) In the early period of the Mahemedan, Satgoan, seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town was the name of one of the Sarkars in Todarmal's rent roll' Sarkars Satgaon included not only the district of Hugli (with Howrah) but also that of the 24 pargena with Calcutta and a portion Bardwan. Satgaon was the traditional mercantile Capital of Pengal from the Pauranic age to the time of the foundation of Hugli by the Portugues in 15;7.

ফলতঃ সরস্বতী নদীর বিশুষ্ক হওয়াই সপ্তগ্রাম সহরের অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

বলা বাহুল্য তখনকার আট লক্ষ আর এখনকার আট লক্ষে অনেক প্রভেদ। তখনকার আট লক্ষ এখনকার প্রায় ২৪ লক্ষের সমান।

হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই বিপুল বৈভবের অধীশ্বর হইয়াও সৎকর্ম্ম নিরত থাকিতেন। ইহারা ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত ও দানশীল বলিয়া জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহাঁদের দানেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ভূমিদান ও অর্থদানের জন্য দিগ্দিগন্তে ইহাদের যশোরাশি প্রসৃত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র দীন দুঃখী ইহাঁদের দয়ায় ও দানে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। দান বিষয়ে গোবর্দ্ধন দাসের যশঃসৌরভই অধিকতর বিস্তৃত হইয়াছিল। তখনকার লোকে বলিত :—

পাতালে বাসকি র্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার সঙ্গীতমাধব নাটকে উল্লিখিত শ্লোক লিখিয়া পরবর্ত্তী কালেও গোবর্দ্ধনের দাতৃত্বের ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ইহাঁদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। অনেকেই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন। বার্ষিক অর্থ দানেরও বিশেষ বরাদ্দ ছিল। ইহা ব্যতীত ইহাঁদের বাড়ীতে বারমাস যাগযজ্ঞ পূজা অর্চনা প্রভৃতি হিন্দুদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যথেষ্ট অর্থ লাভ হইত। দেবদ্বিজের আশীর্ব্বাদে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের কিছুরই অভাব ছিল না। ফলতঃ ইহাঁদের বদান্যতাতে নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপজীবা-চেষ্টা সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে :—

হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥

গুণী ব্যতীত নিগুণ ব্যক্তি গুণীর আদর জানে না। অপণ্ডিত প্রকৃত

পাণ্ডিতের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ নহে। হিরণ্য গোবর্দ্ধন মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, পাণ্ডিত্যের সমাদর করিতেন। বিলাসের বহুল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সদাচারনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া ধার্ম্মিক সমাজেও সমাদৃত হইতেন। শ্রীচরিতামৃতকার ইহাঁদিগকে সৎকুলীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কায়স্থের কুলীন ঘোষ বসু মিত্রাদি। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের প্রকৃতই দাস আখ্যা ছিল কিনা, ইহাতে সে বিষয়ে একটু সন্দেহ জন্মে। দাস আখ্যা কুলীন কায়স্থের নাই। তবে কায়স্থমাত্রেই দাস উপাধি স্বীকার করিতেন। ঘোষ দাস, বসু দাস এরূপ লিখিবার পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ অতি বিনীত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতির মধ্যে কোন আখ্যা বিশিষ্ট হইয়াও নম্রতার পরিচায়ক 'দাস" আখ্যায় আপনাদিগকে অভি-হিত করিতেন। অথবা এমনও মনে করা যাইতে পারে যে ইহাঁরা উচ্চতম কায়স্থ কুলীনদের সহিত কুল কার্য্য করিয়া সমাজপতিত্ব ক্রমে মৌলিকত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সে সময়ে শৌর্য্যে বীর্য্যে ঐশ্বর্য্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বদান্যতায় ও সদাচারে এই দুই সহোদর জনসমাজে যে সবিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাদের বিপুল বৈভবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সময়ে কেবল ভূমির রাজস্ব হইতেই ইহারা আট লক্ষ টাকা লাভ করিতেন তাঁহাদের মোট আয় কত হইত, অনুমানেও তাহা বুঝা যাইতে পারে। ভূমিকর ব্যতীত সে সময়ে আরও বহু প্রকার উপায়ে রাজস্ব আদায় হইত। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলী। বণিকদিগের নিকট যে শুল্ক আদায় হইত, তাহা ভূমিসংক্রান্ত রাজস্বের অন্তর্গত ছিল না। এ কথা অন্যান্য বিষয়েও ইহাদের যথেষ্ট আয় ছিল। এখকার দিনে ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের রাজাধিরাজ অপেক্ষাও হিরণ্য গোবর্দ্ধন অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী ও স্বাধীন ছিলেন। শ্রীমদ্ রঘুনাথ এই গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র। হিরণ্য নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং দুই সহোদরের মধ্যে এই একমাত্র বংশধর উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০ঃ০—

বাল্যকাল ও শিক্ষা।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী কোন্ শকে সহর সপ্তগ্রামের কোন পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নিশ্চযাত্মক প্রমাণ নাই। তবে সম্ভবতঃ ১৪১১ শক হইতে ১৪১৮ শকের মধ্যে কোন সময়ে চাঁদপুর বা তন্নিকটস্থ কোন পল্লীতে এই বৈরাগ্যবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। রঘুনাথের শৈশব জীবনের ঘটনা-বিশেষের উল্লেখ কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চায় পারদর্শিতালাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের শাস্ত্রচর্চার ন্যায় সপ্তগ্রামের বিবিধ স্থানে সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনা হইত। ত্রিবেণীতে শাস্ত্রালোচনার কথা ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। রঘুনাথের জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন, রঘুনাথকে ও বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বালক রঘুনাথ তাঁহাদের পুরোহিত শ্রীমদ্ বলরাম আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন যদিও বিপুল বৈভব-বিলাসের অধিকারিরূপে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বালকের ন্যায়, আহার বিহার ক্রীড়াকৌতুক রঘুনাথের নিকট ভাল বোধ হইত না, তাহার সুধামধুর স্নিগ্ধকান্তিতে শৈশব হইতেই বৈরাগ্যের পবিত্র জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত। রঘুনাথ গুরুগৃহে নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেন, পাঠ অন্তে নির্জ্জনে বসিয়া আপন মনে ভগবচ্চিন্তা করিতেন। বিষয়ের কোলাহল, সমবয়স্ক বালকদের চপলতা তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইত না। শৈশবেই তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি ও বৈরাগ্য ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতে :—

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ॥

যোড়শ পরিচ্ছেদ মধ্যলীলা।

রঘুনাথ স্বভাবতঃই অতি মৃদু, দীনতাভাবাপন্ন ও পবিত্র হৃদয় ছিলেন। ইহার উপর বলরামাচার্য্যের শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার বাল্যহৃদয়ে এই সকল ভাব সমধিক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। বলরামাচার্য্য সুপণ্ডিত ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কু-পাণ্ডিত্যের সহিত গর্ব্ব দাম্ভিকতা ও নাস্তিকতার ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বলরাম আচার্য্য সেরূপ পণ্ডিত ছিলেন না। শ্রীভগবানে তাঁহার একান্ত ভক্তি ছিল। তিনি সাধু সজ্জন পাইলে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজের আলয়ে স্থান দিতেন, তাঁহাদের মুখে শ্রীভগবান্মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেন, আর রঘুনাথ তখন এক পার্শ্বে বসিয়া এক চিত্তে সেই ভগবৎ কথামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

এই সময়ে ভুবনপাবনাবতার শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে উপস্থিত হয়েন। বলরাম আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে পাইয়া অতি যত্নে আপন বাড়ীতে বাসা দিলেন। একখানি নির্জ্জন পর্ণশালায় হরিদাস ঠাকুর অবস্থান করিয়া হরিকীর্ত্তন ও হরিনাম করিতেন। এবার বালক রঘু-নাথের বড় ভাগ্যের উদয় হইল। তিনি সততই হরিদাসের চরণধূলি লাভ করিতেন, আর তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীভগবানের সুধামাখা নাম শুনিয়া বিভোর থাকিতেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে।
আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম আচার্য্য নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাঁতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুর রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ছিলেন না, তাঁহার পিতৃ ও

জ্যেষ্ঠতাত কেবল যে জমিদারী কার্য্য লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন তাহা নহে। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের দান ও সদনুষ্ঠানের বহুল পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহারা পরম পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সভা সততই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সজ্জন দ্বারা সমলঙ্কৃত থাকিত। সাধুর সমাগম হইলে তাঁহারা ভক্তিভবে আপন বাড়ীতে স্থান দিয়া যথাবিধি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনি দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥

এতাদৃশ পিতা ও পিতৃব্যের পবিত্র চরিত, রঘুনাথের বাল্যহৃদয়ে সহস্র গুণ অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছিল। বালক রঘুনাথ শ্রীমদ্ হরিদাসের চরণ-দর্শনে বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করিলেন, এই সময়ে তিনি এক মুহূর্ত্তও তাঁহার চরণ ছাড়া হইয়া থাকিতেন না। হরিদাস বালক রঘুনাথের এতাদৃশী ভক্তি সন্দর্শনে পরম সুখী হইলেন। রঘুনাথের উপরে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি পতিত হইল। ভক্ত সঙ্গ ও ভক্তের কৃপা মহাসাধনের ফল। ভক্তের কৃপাতেই শ্রীভগবল্লাভ হইয়া থাকে। শ্রীচরিতামৃতকার তাই বলিয়াছেন :—

হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে॥

ফলতঃ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস বাল্যকালেও সাধু সজ্জনের সহবাস-প্রয়াসী ও বিষয়ে উদাসী ছিলেন। শ্রীল বলরাম আচার্য্যের গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিলেন কিনা, প্রাচীন কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ভক্তি অর্জ্জন-স্পৃহা অচিরেই বিদ্যার্জ্জন স্পৃহাকে

পরাজিত করিয়া রঘুনাথকে সহসা বিষয়-বিরাগী করিয়া তুলিল। এই সময়ে রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনবিজয়ি নামের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন নাম শুনিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে তাঁহার প্রাণ আকৃষ্ট হইল।

পূর্ব্ব সম্বন্ধ।

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শ্রীমদ্ হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের সুপরিচয় ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই ভ্রাতাই অনেকের উপজীব্য যোগাইতেন। বিশেষতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে এই দুই ভাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিও ইহাঁদিগকে ভ্রাতার মত জ্ঞান করিতেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক রূপমাধুরী ও শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষী প্রতিভার কথা সততই ইঁহারা আলোচনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে:—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃ ব্যবহার॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবন।
অতএব ভাল মতে জানেন দুইজন॥

ইঁহারাও বাল্যকাল হইতেই প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, প্রভুও তাঁহার শৈশব হইতেই ইহাঁদিগকে জানিতেন। প্রভু ইহাঁদিগকে "আজা" বলিয়া ডাকিতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:—

প্রভু কহে তোমার পিতা জ্যেষ্ঠ দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে॥

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শূদ্রে এইরূপ ব্যাবহারিক ভ্রাতৃভাব দেখা যাইত। এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থলে উভয় পরিবারের পারিবারিক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা উভয় পরিবারেরই সুবিদিত হইত। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শ্রীমান্ রঘুনাথ আপন ঘরে বসিয়াই শ্রবণ করিতেন, আর তাঁহার শ্রীপদযুগল-সন্দর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয়ের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ বাল্য সময়ে তিনি দুই একবার মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভও করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থে তাহার প্রমাণাভাব।

শ্রীগৌরাঙ্গ যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন সেদিন সমগ্র বঙ্গ এই সংবাদে একবারে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ঝটিকা-বিতাড়িত দাবানলের ন্যায় এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ অতি অল্প সময়েই সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। এ সংবাদে কেহ বিস্মিত, কেহ চমৎকৃত, কেহবা স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে অনেকেই একবারে মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অচিরেই সপ্তগ্রামে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি মহশয়ের ভ্রাতৃবৎ শ্রীল হিরণ্য দাস ও শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস এই হৃদয়-বিদারক সংবাদে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। অতঃপরে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমে তিনদিবস কাল রাঢ় দেশে বিচরণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরের অপর পারে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন এবং এই সংবাদ পাইয়া তথা হইতে শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে আনাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস এই সংবাদে আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার প্রাণারাধ্য নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের চরণ দর্শন করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন, তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহারা তখন বুঝিলেন না যে, এই নবীন সন্ন্যাসীর দর্শনে নবানুরাগী রঘুনাথের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের কি প্রবল ভাব সঞ্চারিত হইবে; তাঁহারা তখন বুঝিলেন না যে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রঘুনাথ কিছুতেই আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। নবানুরাগিণী তরুণী যখন হৃদয়ের প্রিয়তম প্রাণবল্লভের মুখকমল একবার দেখিতে পায়, তাঁহার সুধামাখা কথা শুনিতে পায়, সে কি আর তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারে, না, গৃহসুখ তাহার মন বাঁধিয়া রাখিতে পারে? হিরণ্য গোবর্দ্ধন অতি বুদ্ধিমান্ হইয়াও তাঁহাদের পুত্র শ্রীমদ্ রঘুনাথের মনের ভাব ভালরূপে তখনও বুঝিতে পারিলেন না, তাই তাঁহারা নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দর্শন করার জন্য শ্রীমদ্ রঘুনাথকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম মিলন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের জন্য পিতা ও পিতৃব্যের আদেশ পাইয়া রঘুনাথের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি উৰ্দ্ধশ্বাসে শান্তিপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন। শান্তিপুরে কীর্ত্তনের তরঙ্গ বহিতেছে, মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইতেছে। অনেকেই নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ভারতী গোসাঞীকে গালি দিতেছে। রঘুনাথ এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অতি ধীরে ধীরে প্রভুর চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া বালক রঘুনাথের নয়ন অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল, দেহ রোমাঞ্চিত ও অবশ হইল, রঘুনাথ অমনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর শ্রীচরণসমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শান্তিপুরে আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
প্রভুপাদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥

প্রভু রঘুনাথকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া উঠাইলেন। রঘুনাথ ধনী-লোকের সন্তান, সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং সকলেরই সুপরিচিত। শ্রীল অদ্বৈতার্য্যের সহিত হিরণ্য গোবৰ্দ্ধন দাসের বিশিষ্ট পরিচয় ছিল। অতএব আচার্য্য প্রভু অতি যত্ন করিয়া রঘুনাথকে স্থান দিলেন। যতদিন প্রভু শান্তিপুরে রহিলেন, রঘুনাথ ততদিন তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠসুখও তুচ্ছবোধ করিলেন। সে সুখ সাধারণ জীবের দুর্ব্বোধ্য। অনুমানেও আমাদের পক্ষে সে সুখের ধারণা হইবে না। রঘুনাথ শান্তিপুরে পাঁচ সাত দিন থাকিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর কৃপায় তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তারে হইলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥

যাহা ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের প্রসাদে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস সেই ভগবদুচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইলেন। ইহা অপেক্ষা সাধন-ফল আর কি হইতে পারে? ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন,—সাধনের বল বলিয়া কীর্ত্তিত। কিন্তু ভগবদুচ্ছিষ্ট ভোজন সাক্ষাৎ সাধন-ফল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তভুক্ত-শেষের যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এই :—

ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

কঠোর সাধনে যাহা লভ্য, রঘুনাথের সহজেই তাহা লাভ হইল। তিনি ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভগবদুচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মাদিও ভগবদুচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি জন্য নিরন্তর বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যথা :—

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরে স্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥

ফলতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ-সেবনে রঘুনাথের প্রেমসিক্ত হৃদয়ে প্রেমের প্রবল তরঙ্গ বহিল। কিন্তু হায় প্রেমদাতা মহাপ্রভুর চরণারবিন্দ সন্দর্শনের সৌভাগ্যের দিন অচিরেই অস্ত হইল। মহাপ্রভু আর কাল বিলম্ব না করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিপদ যামিনীর চাঁদের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের পদনখচন্দ্র রঘুনাথের হৃদয় অতি অল্পক্ষণ আলোকিত করিয়াই অদর্শন হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন, আর রঘুনাথের নিকট সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইল। তিনি নয়নজলে বুক ভিজাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে ফিরিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে তিনি একরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতে :—

প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥

নবানুরাগ।

রঘুনাথের নবানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল, শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে একবারে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ফলতঃ রঘুনাথ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, লোকের কথা লোকের সঙ্গ,—তাঁহার নিকট আর ভাল বোধ হইল না, তিনি একাকী বিরলে পড়িয়া থাকিতেন, আর সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ তাঁহার হৃদয়ে জাগিত। শ্রীল নরহরি ঠাকুরের একটী কবিতায় শ্রীমদ্ রঘুনাথের মনের ভাব এস্থলে বর্ণনা করা যাইতে পারে। সে কবিতাটী এই।—

মরম কহিব সজনি কায
মরম কহিব কায।
উঠিতে বসিতে দিক্ নেহারিতে
হেরি যে গৌরাঙ্গরায়॥
হৃদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল
সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটি নয়নে কত না হেরিব
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ
কি হলো মোর এ সখি॥
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ
গৌর হেরি যে সদা।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথ এইরূপ শ্রীগৌরচরণ চিন্তায় শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে প্রকৃতই উন্মত্ত হইলেন। এমন অবস্থায় ঘরে তিষ্ঠিয়া থাকা অসম্ভব। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্নেহময় পিতৃব্য, পিতা এবং জননী যাঁহাকে মুহূর্ত্তের তরে চখের আড়ালে রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, একমাত্র স্নেহের ধন সেই রঘুনাথকে তাঁহারা গৃহ ছাড়িয়া উদাসী হইতে অনুমতি দিবেন, ইহা অসম্ভব। রঘুনাথ তাঁহার মনের ভাব জানাইলেন, কিন্তু তাহা একেবারেই নিষ্ফল হইল। তিনি অগত্যা পলাইয়া ঘরের বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টাও বিফল হইল। রঘুনাথের তখন ক্লেশের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন নীরব হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবানের প্রেমে হৃদয় যখন উন্মত্ত হইয়া উঠে, সে ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ নহে। এই সময়ে শ্রীল রঘুনাথের যে ভাবোদগম হয়, তাহা উজ্জ্বল অনুরাগের প্রকট দৃষ্টান্ত। পাঠক, মহাপ্রভুর অনুরাগের একটী পদ এখানে স্মরণ করুন :—

কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার
বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল
না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচাঁদে।
উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি করি কান্দে॥
তিতিয়া গেয়ল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘল শ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি যেন হেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥

অপিচ—

প্রিয় পারিষদগণ বুঝায় তাঁহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥

ভক্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইলে যে অনুরাগ প্রকাশ পায়, উহা শ্রীমতী রাধার কৃপাপ্রসাদ মাত্র। শ্রীমতী রাধার ভাব ভিন্ন কৃষ্ণ-প্রেমের আস্বাদ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগে শ্রীমতী উন্মাদিনী, তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে এক মুহূর্ত্ত ঘরে তিষ্ঠিতে পারেন না। যথা পদ :—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে দশবার
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।

এইরূপ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার ভাব ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ভক্ত কেও প্রেমোন্মত্ত করিয়া তোলে। শ্রীমতী যেমন কৃষ্ণানুরাগে কৃষ্ণ-লাভের জন্য জাতি কুল শীল ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হন, গৃহবন্ধনে যেমন আর তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না, ভক্তহৃদয়েও সেই ভাবের কণালেশের উদ্রেক হয়। শ্রীমতীর উক্তিতে জ্ঞানদাসের আরও একটী পদ শুনুন :—

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বাঁধিব আঁচল দিয়ে॥
আপনা বন্ধুয়া বান্ধিয়া আনিব
আমি না ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ
নারীবধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে
সে শ্যাম নাগরের হাতে।

বান্ধিয়া কেমনে রাখিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাস কহে বিনয় বচনে
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা॥

ফলতঃ ভক্তহৃদয়ে শ্রীমতীর অনুরাগের কণালেশ সঞ্চারিত হওয়া মাত্রই ভক্ত প্রেমে পাগল হয়েন, শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির জন্য হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, সংসারের সুখকর কোন দ্রব্যেই আর তখন চিত্ত আকৃষ্ট হয় না ; বিলাস-লালসা তো অতি তুচ্ছ কথা, জীবনের অতি প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়, অতি পুজনীয় স্নেহের দেবতা পিতা মাতার স্নেহ পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্থান পায় না, সর্ব্বগ্রাসী শ্রীকৃষ্ণানুরাগ সমগ্র হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লয়েন, আর প্রাণ কেবল দিবানিশি তাঁহার চরণ পানে আকৃষ্ট হয়।

স্নেহের অত্যাচার বা নিদারুণ বাধা।

শ্রীগৌরানুরাগে রঘুনাথের চিত্ত এইরূপ আকৃষ্ট হইল। তিনি গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াও সকল মনোরথ হইতে পারিলেন না। সুচতুর পিতা ও পিতৃব্য অতি অল্প দিনেই রঘুনাথের চেষ্ট বুঝিতে পারিলেন। রঘুনাথ শ্রীগৌরপ্রেমে আকুল হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে যাইবার জন্য যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবার উহঁারা উহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া অধিকতর যত্নের সহিত গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। কিন্তু রঘুনাথ প্রতিনিয়তই গৃহ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য তখন দেখিলেন, কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন রঘুনাথের পলায়নে বাধা দেওয়া যাইবে না। এই এই নিমিত্ত সতত তাঁহার রক্ষার জন্য পাঁচজন পাইক, চারিজন ভৃত্য ও দুইজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে :—

বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বাঁধি রাখেন আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥

রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১১ জন লোক নিযুক্ত করিয়াও পিতৃব্য ও পিতা নিশ্চিন্ত হইলেন না। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও ঔদাস্য ভাব দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমদ্ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস একটী পরমা সুন্দরী বালিকার সহিত রঘুনাথের বিবাহবন্ধন ঘটাইয়া দিলেন। কিন্তু হায় বালিকাটির রূপলাবণ্য ও মধুর সম্ভাষণ রঘুনাথের চিত্তে আনন্দের কারণ না হইয়া অতীব ভয়ের কারণ হইল। বালিকা তাহার প্রিয়তম পতির এই ভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেন, তাহার চিত্ত সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেন, রঘুনাথ ইহা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, মুখে কিছু বলিতেন না, মনে মনে উত্যক্ত হইতেন। বালিকাটী তাঁহার প্রাণেশ্বরের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন এবং নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেন।

কিন্তু স্নেহের এমন স্বভাব, পিতৃব্য ও পিতা রঘুনাথের চিত্ত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করার জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিলেন, বিবিধ বিলাস উপকরণ তাহার সম্মুখে সংগ্রহ করিয়া দিলেন, কিন্তু রঘুনাথ সে সমস্ত দেখিয়া বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। রঘুনাথ এই সকল দেখিয়া আরও অধিকতর উত্যক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিলেন। হায়, হিরণ্য গোবর্দ্ধন এত বুদ্ধিমান হইয়াও রঘুনাথের ভগবদনুরাগময় প্রবল ভাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন না, রঘুনাথ এখন বৈকুণ্ঠের সুধা-সৌরভে আত্মহারা, তাঁহারা বুঝিলেন না রঘুনাথ এখন শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ-মকরন্দের জন্য ব্যাকুল, এই সকল পার্থিব বিলাস সামগ্রী এখন তাঁহার পক্ষে বিষ্ঠা হইতেও অধিকতর ঘৃণণীয়। গোলোকের প্রেম-সুধা সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে রঘুনাথ একবারে বিভোর হইয়া পড়িলেন,

আধ্যাত্ম তত্ত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহা বায়ুরোগ বলিয়া স্থির করিলেন। এমন কি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল।

রঘুনাথ রাজপুত্র হইয়াও এই অবস্থায় কারাক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে অনাহারে ও অনিদ্রায় রঘুনাথ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন, আত্মীয় স্বজন তখনও তাহার প্রকৃত ব্যাধি ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের সুখের সংসারে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। স্নেহময়ী মাতা স্নেহময় পিতৃব্য ও পিতা অতুল বৈভব ও [illegible] সম্পদের অধিকারী হইয়াও [illegible] দশা দেখিয়া সর্ব্বদাই [illegible], এক মুহূর্ত্তও তাহাদের প্রাণে শান্তি ছিল না। কিন্তু [illegible] মানে, [illegible] চঞ্চল। [illegible] তাহার সমক্ষে [illegible] ও বিবিধ [illegible] তাহার যেমন প্রবৃত্তি থাকে না, সে যেমন [illegible] পিঞ্জর [illegible] ব্যাকুল হয়, রঘুনাথও তেমনি সর্ব্বদা সেই [illegible] লাগিলেন। আর দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্তা করিয়া [illegible] লাগিলেন।

কৃপাময় পাঠক, সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে হইলে, শ্রীভগবানের জন্য কত অধিক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির প্রয়োজন, শ্রীমদ্ রঘুনাথের এই ব্যাকুলতা হইতে তাহা একবার বুঝিয়া লউন। শ্রীভগবানের সমস্ত লীলাই জীবশিক্ষার নিমিত্ত। তিনি অতি সত্বরে এছেন রঘুনাথকে স্বীয় চরণ সমীপে লইতে পারিতেন, কিন্তু প্রেমোৎকণ্ঠা বৃদ্ধিই তাঁহার এক প্রধান [illegible]। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের সহসা অন্তর্দ্ধানে ব্রজবধূগণ তাঁহার পদ-[illegible] ব্যাকুল হইলেন, সমগ্র বনভূমিতে বিচরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার দর্শন পাইলেন না, অবশেষে তাঁহারা একবারে অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে বসিলেন, তাহাদের নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমিকাগণকে সহসা দর্শন দিলেন না, অবশেষে যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাহাদের প্রাণ বক্ষা

অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন তিনি তাঁহাদিগের দর্শন দিলেন। এই সময়ে সখীরা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলেন, আমারা এ পর্য্যন্তও তোমাকেও চিনিতে পারিলাম না। সংসারে অনেক প্রকার লোক আছে, তন্মধ্যে কেহ ভজনা পাইলে প্রতিদানে তাহার ভজনা করে, কেহ ভজনা না করিলেও ভজন করে, :কেহ বা ভজনা পাইলেও ভজনা করে না, না পাইলেও ভজনা করে না—ইহার মধ্যে তুমি কোন প্রকার চরিত্রবিশিষ্ট ?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমার চরিত্র ইহার কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহে। আমি কেবল তোমাদের প্রেমবিপ্রলম্ভের উত্তরোত্তর প্রবাহবৃদ্ধি দর্শনের জন্যই অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত প্রেমের বৃদ্ধি হয় না।

শ্রীভগবান্ এই জন্য নিজজনকে সময়ে সময়ে বিরহ-ক্লেশে নিপাতিত করিয়া প্রেমপ্রবাহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া লয়েন। শ্রীমদ্‌রঘুনাথও স্নেহময় পিতৃগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে নিদারুণ কারাক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এগার জন প্রহরীর দৃষ্টি হইতে তাঁহার আর পলায়নেরও সুবিধা রহিল না। তিনি দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

—∞—

পুনর্দ্দর্শন।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে ক্রমাগত চারি বৎসর কাল নিদারুণ দুঃখে অতিবাহিত করিলেন। সন্ন্যাসের চারি বৎসর ও কতিপয় মাস পরে গৌড়দেশে আবার শ্রীগৌরচন্দ্রমা উদিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথের নয়ন-চকোর আবার শান্তিপুরে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণ-নখচন্দ্রের সুধাপানে সাতদিন বিভোর হইয়াছিলেন। এই ঘটনার আনুপৌর্ব্বিক বিবরণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

মহাপ্রভু ১৪৩১ শাকের মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিলেন, বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাইতে মনন করিলেন। দুই বৎসর কাল দক্ষিণে ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে শুভাগমন করিলেন। নীলাচলে আসিয়া বৃন্দাবন যাইতে মনন করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, তিনি শ্রীল সার্ব্বভৌম ও শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়কে বলিলেন,—প্রভু নীলাদ্রি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনারা তাঁহাকে এখানে যত্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন। তাঁহার অদর্শনে আমার এই রাজ্যসুখ-সম্পদ কিছুই ভাল বোধ হয় না। যাহাতে তিনি অন্যত্র না যান, আপনারা তাহারই উপায় করুন।

রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম বলিলেন, প্রভু রথযাত্রার সময় অতি নিকট, রথযাত্রা না দেখিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না। প্রভু রথযাত্রা পর্য্যন্ত রহিলেন। রথযাত্রার পরে প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উদ্যোগ করিলেন। ইহাঁরা বলিলেন, প্রভো, চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে আর কোথায় যাইবেন, কার্ত্তিকমাসে যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন করিবেন।

প্রভু দ্বিরুক্তি করিলেন না। কার্ত্তিক মাস আসিল, প্রভু আবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উদ্যোগী হইলেন, আবার তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও রায় মহাশয় বলিলেন প্রভু এমন দারুণ শীতের সময় কোথায় যাইবেন, শীতের অবসান হউক, দোলযাত্রা দেখিয়াই গমন করিবেন। ফলতঃ বিরহভয়ে ইঁহারা নানাপ্রকার আপত্তি তুলিয়া প্রভুর গমনে বাধা দিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বতন্ত্র হওয়াও ভক্তের অধীন। তিনি ভক্তের অনুরোধে আবদ্ধ হইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ-

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥

এইরূপে দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার পুনঃপুঃ উদ্যোগ হইল, কিন্তু শ্রীল সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের আপত্তিতে প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া ঘটিল না। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে গমনের জন্য তাঁহার চিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। রথের সময় উপস্থিত। রথ দেখিয়া আর অপেক্ষা করিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। রথের সময় উপস্থিত হইলে গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন শুনিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া গৌড়ে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু তখন সকলের নিকট অনুমতি চাহিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবনে যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়েরে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমা দোঁহার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।
অবশ্য চলিব দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনা মোর অন্য নাহি গতি॥

প্রভু অনুমতি চাহিলেন, তিনি কোন্ পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। প্রভু বলিলেন :—

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥

রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম দেখিলেন প্রভুর প্রস্তাবে আর আপত্তি করা ভাল নয়। তবে এক কথা এই যে এখন বর্ষাকাল এ সময়ে প্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে দেওয়া হইবে না। ইঁহাদের অনুরোধে তিনি বর্ষা কাল চারি মাস নীলাচলে যাপন করিয়া শুভ বিজয়া দশমীতে গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। রামকেলি গ্রামে শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন হইল। শ্রীল সনাতন বলিলেন এত লোক সংঘট্ট লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া ভাল দেখায় না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবনে যাওয়ার এ নহে পরিপাটী॥

প্রভু রামকেলী হইতে কানাইর নাটশালায় আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি শ্রীল সনাতনের কথা আবার মনে করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন।
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রস ভঙ্গ॥
একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভায় বৃন্দাবনের গমন॥

প্রভু স্থির করিলেন এ যাত্রায় বৃন্দাবনে যাইব না। যাত্রা পরিবর্ত্তন করিব। তিনি প্রাতে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণদিকে চলিয়া আসিলেন। ধীরে ধীরে শান্তিপুরে

আসিয়া উপনীত হইলেন। এইবার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে প্রভু সাত দিন অবস্থান করেন।

এই সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে সাতদিন কাল দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীমহাভুর শ্রীচরণ দর্শন করার সুবিধা লাভ করিলেন। ফলতঃ সন্ন্যাসের পরে প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইলে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস এই দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। কি প্রকারে এই শুভ সন্দর্শন সংঘটন হয়, তাহা বলিতেছি।

রঘুনাথ এই সময়ে বন্দিভাবে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুজনের অনুমতি ভিন্ন তাঁহার ঘরের বাহির হইবার উপায় ছিল না। তিনি সহসা শুনিতে পাইলেন মহাপ্রভু শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার চিত্ত তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিপাসার্ত্ত পথিক সম্মুখে স্বাদু জলপূর্ণ সরোবরের সংবাদ পাইলে যেমন উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হয়, শান্তিপুরে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার জন্যও রঘুনাথ সেই প্রকার আকুল ও অধীর হইয়া উঠিলেন। পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ আমাকে অনুমতি করুন, আমি একবার শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আসি, নচেৎ কিছুতেই আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

স্নেহের পুত্রের এইরূপ কাতর আর্ত্তি বাক্য শুনিয়া শ্রীমদ্ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস আর অধিক আপত্তি না করিয়া বহুদ্রব্য ও লোকজন সঙ্গে দিয়া রঘুনাথকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইলা তারে, "শীঘ্র আসিহ" কহিয়া॥

রঘুনাথ উর্দ্ধশ্বাসে শান্তিপুরে আসিয়া শান্তিলাভ করিলেন, মহাপ্রভুর

চরণ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সুধাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু তিনি সুধাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিতেন, "আমি কি প্রকারে রক্ষকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, কি প্রকারেই বা প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে অবস্থান করিয়া নিরন্তর এই গোলোকসুখ উপভোগ করিব?"

প্রভুর উপদেশ।

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অন্তর্যামী। রঘুনাথের মনের কথা তিনি জানিলেন, তাঁহাকে শিক্ষারূপে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া এক অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

স্থির হৈঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ রঘুনাথের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে এই উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি প্রযোজ্য। সহসা ভবসিন্ধু হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, এজন্য সাধন প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাধন আন্তরিক হওয়া উচিত। লোকদেখান মর্কট বৈরাগ্যে অন্তঃকরণ শুষ্ক হইয়া উঠে। উহা ভক্তির সুধাধারায় পরিসিক্ত হয় না। উহা বাহ্য। ভক্তির মন্দাকিনী অন্তঃপ্রবাহিনী। সুধাময়ী ভক্তিদেবীর কৃপাপ্রসাদের জন্য আন্তরিক নিষ্ঠা প্রয়োজনীয়। আন্তরনিষ্ঠা ভিন্ন কেবল বাহ্য লোক-দেখান মর্কট বৈরাগ্য অধঃপতনেরই কারণ। কেননা, উহাতে মানসিক বৃত্তি বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে চিত্ত অনুক্ষণ আকুল রহে, ভক্তিদেবী স্বতঃই তাহা হইতে দূরে চলিয়া যান। সুতরাং মর্কট বৈরাগ্য সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। কিন্তু তাই বলিয়া বিলাসের কোমল শয্যায় অনুক্ষণ বিলাস-সেবা,—ভক্তজনবাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ স্থলে "যথাযোগ্য বিষয় ভোগের" আদেশ করিয়াছেন। ভজননিষ্ঠ সাংসারিক লোকের পক্ষে "লোক-ব্যবহার রক্ষা" করিয়া "যথাযোগ্য বিষয় ভোগ" করার উপদেশই প্রভুর আজ্ঞা। ভজননিষ্ঠ সাংসারিক লোকের জন্য যথাযোগ্য বিষয় ভোগের ব্যবস্থা শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্যবস্থিত। প্রভু লোক ব্যবহার ও বিষয় ভোগের যে আজ্ঞা করিয়াছেন, "যথাযোগ্য" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সেই বিষয় ভোগের সঙ্কোচ ও সমান ব্যবস্থিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত 'অনাসক্ত" শব্দ দ্বারা আরও দৃঢ় রূপে প্রভু এই আদেশ করিয়াছেন যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগ্য বিষয় ভোগ করিলেও তাহাতে যেন চিত্তের আসক্তি না জন্মে। নির্লিপ্তভাবে ও অনাসক্তচিত্তে বিষয় ভোগের প্রকৃষ্টতর উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ন লিপ্ত [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] হইয়াও [illegible] নিবন্ধ [illegible] জড়িত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

জনক রাজা বিষয়-ভোগ করিতেন, কিন্তু বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় বিলাস-বৈভবের মধ্যে বাস করিতেন কিন্তু তাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া থাকিত। কবিবর কালিদাস তাই মহাদেবের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;-

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও স্থিত-ধী ব্যক্তির এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে। বিষয়-কোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যাঁহারা শান্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। যে বৈরাগ্য বিষয়-কোলাহলে ক্লিষ্ট হয়, সন্ত্রস্ত হয়, সে বৈরাগ্য অতি কোমল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথের উপদেশচ্ছলে সাংসারিক লোকদিগকে এই উপদেশ দিলেন যে, প্রলোভন সম্মুখে থাকিলেও তাহাতে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, বিষয়ের শত কোলাহল তরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ব্যাকুলতাজনক গর্জ্জন করিলেও

প্রকৃত বৈরাগ্যশীল চিত্ত তাহাতে বিক্ষুব্ধ বা বিত্রস্ত হয় না। এই বৈরাগ্যেই যুক্তবৈরাগ্য বা দৃঢ়বৈরাগ্য। শ্রীভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। ইহা অতি দৃঢ়। ইহার বিনাশ, পতন বা বিচ্যুতি নাই। এই বৈরাগ্যই প্রকৃতই বৈরাগ্য। অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ এইরূপ বৈরাগ্য অর্জ্জনের একতম সাধন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আরও এক উদ্দেশ্য এই ছিল যে তিনি এবার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি কিয়ংকাল অবস্থান করিবেন। শ্রীমদ রঘুনাথ দাস এই সময়ে নীলাচলে গেলে মহাপ্রভুর সঙ্গ পাইবেন না। বিশেষতঃ তাঁহার পিতামাতা ও স্ত্রী প্রভৃতির মনে ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা জন্মাইয়া রঘুনাথের সংসার ত্যাগ করানই শ্রেয়ঃ। এইরূপ অনেক বিষয় মনে করিয়া দয়াময় মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমি এখন নীলাচলে যাইতেছি, তথা হইতে সত্বরেই শ্রীবৃন্দাবনে যাইব। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে তখন তুমি নীলাচলে যাইও। রক্ষকের হাতে তুমি কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইবে, তুমি মনে ইহাই ভাবিতেছ। সে জন্য তোমার চিন্তা কি? তৎকালে উপায় তখন হইবে। কৃষ্ণ তখন তোমার হৃদয়ে সে বুদ্ধির সঞ্চার করিবেন। যাহার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল, সংসারবন্ধনে তাহাকে কে কয় দিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে? এ জন্য তুমি কিছুমাত্র ভাবিও না। যথাসময়ে কৃষ্ণ অবশ্যই তোমার উদ্ধার করিবেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশে আসিও কোন ছলে।
সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে

শ্রীমদ্ রঘুনাথ এই উপদেশ বাক্য আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। প্রভু সাত দিন শান্তিপুরে ছিলেন। রঘুনাথও সপ্তাহকাল সেখানে থাকিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শনানন্দে বিভোর হইলেন।

বাহ্যভাবের পরিবর্ত্তন।

অতঃপর তিনি নীলাচলে যাত্রা করিলেন। রঘুনাথ তাঁহার উপদেশামৃতে সঞ্জীবিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং সেই উপদেশ অনুসারে বহির্বৈরাগ্য ভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়া সংসারীর ন্যায় লোকব্যবহার দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়া বুঝিলেন এবার বুঝি রঘুনাথের মন ফিরিয়াছে। রঘুনাথ দৃশ্যতঃ বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। রঘুনাথের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসিবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আর প্রহরী রাখারও আবশ্যকতা রহিল না। রঘুনাথ বিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লোকে তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। লোক ব্যবহার, বিষয় মধ্যে অবস্থান ও বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া সকলেই মনে করিল রঘুনাথের প্রবল বৈরাগ্য বুঝি অন্তর্হিত হইয়াছে। ভ্রান্ত-জীব বুদ্ধি! ইহারা বুঝিতে পারিল না যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া রঘুনাথ কেবলই বিষয়-বাসনা জয় করিতেছেন, বিষয়প্রবৃত্তির নামে তাহার বিষয়-নিবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, আসক্তির আভাসে পূর্ণমাত্রায় তিনি অনাসক্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই ভাবে শ্রীমদ্ রঘুনাথ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার নীলাচলে শুভ প্রত্যাবর্ত্তনের কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্বেগ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। সকলেই একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু রঘুনাথের ভাবের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই, পিতা মাতা ও নিকটস্থ আত্মীয়গণের হৃদয়ে এ ধারণা কিয়ৎ পরিমাণে রহিয়া গেল।

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ পাইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ বাহ্যভাবে বিষয়ীর মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য-পবিত্র চিত্ত কোন ক্রমেই সংসারে আসক্ত হইল না। বাহিরের লোক বাহিরের ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, রঘুনাথ এখন বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কি পিতামাতার আন্তরিক সন্দেহ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। আর যে তাঁহারা রঘুনাথকে হারাইবেন, এ সন্দেহ তাঁহাদের আর রহিল না। সুতরাং তাঁহার

অনেক দিনের দুশ্চিন্তা হইতে শান্তিলাভ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ি-প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখি তার পিতামাতার আনন্দিত মন॥

এইরূপ অনেক দিন অতিবাহিত হইল। শ্রীমদ্ রঘুনাথ কেবল প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়াই গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভু রঘুনাথকে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে তুমি তখন নীলাচলে যাইও। রঘুনাথ প্রভুর প্রত্যাগমন-সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

একদিন রঘুনাথ শুনিতে পাইলেন শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভু নীলা-চলে আসিয়াছেন। রঘুনাথের মন আবার তখনই বিচলিত হইয়া উঠিল। কি প্রকারে মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইবেন তিনি তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে এক বিষম দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। বিষয় প্রকৃতই বিষময়। শ্রীল হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস এই সময়ে বিষয় লইয়া বিষম বিপদে পতিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষয়ে বিষম বিপদ্।

পাঠকগণের স্মরণ আছে ইতঃপূর্ব্বে জনৈক ম্লেচ্ছ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে বাদসাহ এই মুলুকের একটী পয়সাও লাভ করিতে পারিতেন না। রাজস্ব আদায় করিয়া সমস্তই তিনি আত্মসাৎ করিতেন। সরকার হইতে তখন সপ্তগ্রামের স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের প্রস্তাব হয়। শ্রীল হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস ভ্রাতৃযুগল এই সময়ে মোক্তাসূত্রে মুলুকের করআদায় তহশীল ও শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা এই হয় যে সপ্তগ্রামের রাজস্ব আদায় হউক আর না হউক, প্রতিবর্ষে তাঁহারা রাজসরকারে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। এই বন্দোবস্তে ইহাদের বেশ লাভ হইত। কেননা, সপ্তগ্রাম হইতে ইহারা প্রজা উৎপীড়ন না করিয়াও ২০ লক্ষ টাকা আদায় করিতেন।

ইহা দেখিয়া পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তা চৌধুরী সাহেবের চিত্তে ঈর্ষার তুষানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নানাপ্রকার কুচক্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুচক্রে ও ষড়যন্ত্রে বাদসাহ বুঝিতে পাইলেন, সপ্তগ্রামের বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই। হিরণ্য দাস মোক্তাদার হইয়া আটলক্ষ টাকা লাভ করিতেছে, আর তিনি মুলুকের মালিক হইয়া সেই সপ্তগ্রাম হইতে কেবল ১২ লক্ষ টাকা পাইতেছেন। তখন তিনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কতকগুলি সৈন্যসহ একজন উজিরকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা সহসা আসিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইল। হিরণ্য গোবর্দ্ধন পলায়ন করিলেন। রঘুনাথকে বাদসাহের সৈন্যেরা ধৃত করিবে এ সন্দেহ তাঁহাদের মনে হইল না। বিশেষতঃ রঘুনাথ নিজেও তজ্জন্য ভীত নহেন। তিনি সংসারের যে দারুণ বন্ধনে ছিলেন, তাহা অপেক্ষা কঠোরতর কারাক্লেশ তাঁহার পক্ষে আর কি হইতে পারে। বাদসাহের সৈন্যগণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

চার লক্ষ দেয় রাজারে, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্য দাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥

রঘুনাথের প্রশান্ত ও নির্ভিক চিত্ত ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তবে এই ব্যাপারে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের হৃদয়ে যে একটী অভিনব ক্লেশের কারণ হইল, তিনি সময়ে সময়ে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহার একমাত্র শরণ, অবলম্বন ও ভরসা, এ সকল মহাবিপদ্ও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রাহ্য বলিয়াই অনুমিত হয়। সুতরাং রঘুনাথ এ বিপদকে আদৌ বিপদ বলিয়া মনে করিলেন না। বাদসাহের লোকেরা রঘুনাথকে কারারুদ্ধ করিয়া নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার বাপ ও জেঠা কোথায় আছে প্রকাশ করিয়া বল, এবং তাহাদিগকে এখানে হাজির করিয়া দাও, নতুবা তোমাকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।" রঘুনাথ এই ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি নীরবভাবে ভগবচ্চিন্তায় মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে কোন কোন দুষ্টলোক পরামর্শ দিল যে রঘুনাথকে দৈহিক যাতনা না দিলে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না। পরামর্শ স্থির হইল, রঘুনাথকে প্রহার করিয়াই গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া লওয়া হইবে। এক দিবস রঘুনাথকে প্রহার করার জন্য আনা হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, চক্ষু দুটী ভগবৎপ্রেমে ঢল ঢল, তাহাতে যেন কি এক অমিয়মাখা মধুর ভাব বিরাজিত। রঘুনাথের স্নিগ্ধ কোমল অথচ প্রশান্ত ও বিনয়-নম্র সুন্দর মুখখানি দেখিয়া বাদসাহ সরকারের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। রঘুনাথকে প্রহার করার স্পর্দ্ধা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই প্রেমে পুলকিত হইতেন। বিশেষতঃ রঘুনাথের জ্যেষ্ঠতাত জাতিতে কায়স্থ, অতি বুদ্ধিমান্ ও চক্রী। বাদসাহ জানিতেন কায়স্থ অতি চক্রী ও বুদ্ধিমান্ জাতি। তাহাতে হিরণ্যের বিষয়-বুদ্ধি ও চক্রকৌশল অতীব গভীর। পাছে রঘু-

নাথের প্রতি কোনরূপ অতিরিক্ত কঠোর ব্যবহার করিলে বিপক্ষ পক্ষে যোগ দিয়া হিরণ্য দাস একটা বিপ্লব ঘটাইয়া তুলেন, এই ভয়েও বাদসাহ রঘুনাথের প্রতি সবিশেষ কোন কঠোর ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করিলেন না। তবে তর্জ্জন গর্জ্জন যথেষ্ট চলিতে লাগিল। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
যাও জেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পাবে মারিতে॥
বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ভয়।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর॥

রঘুনাথ দেখিলেন এরূপে এখানে অবস্থান করিয়া সময় নষ্ট করিলে পিতা ও পিতৃব্যের কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। তিনি মনে মনে এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন জগতে যত নীতি আছে এক এক নীতির এক এক স্থলে অধিকার। এ স্থলে বিনতিই প্রধান নীতি। তিনি এক দিবস বাদসাহকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "জাহাপনা, এ অধীনের একটা কাতর নিবেদন আপনাকে শুনিতে হইবে। আমি মনে করি, আমার পিতা ও জেঠা আপনারই ভ্রাতা। আপনারা ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ করিতেছেন। কোন সময়ে কলহ এবং কোন সময়ে প্রীতি হইতেছে। এখন মনোমালিন্য হইয়াছে, আবার দু'দিন পরেই আপনাদের প্রীতি হইবে, আপনাদের তিনজনের সদ্ভাব হইবে, তিনজনে একত্র হইবেন। তবে অনর্থক দীর্ঘকাল এ মনোমালিন্য রাখিবার প্রয়োজন কি? আমি যেমন আমার পিতার স্নেহের সন্তান, তেমনি আপনারও স্নেহের পাত্র আমার পিতা আমার যেমন পালক আপনিও তেমনই পালক। পালক হইয়া পাল্যকে এইরূপ তাড়না করা শোভা পায় না। আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, আপনাকে আমি জিন্দাপীর বলিয়াই মনে করি, আপনি যদি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন, তবে আমায় স্নেহ করিবে কে?" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ পায়॥
আমার পিতা জেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ কর তোমরা সর্ব্বদাই॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, নিশ্চয় কিছু নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার পালক।
আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক॥
পালক হৈঞা পাল্যের তাড়না না যুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়।

একে রঘুনাথের প্রেমভক্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ-কোমল শ্রীমুখমণ্ডলের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহার উপরে তাঁহার সুধা-মধুর ভাষা, তাহার উপরে আবার সে ভাষা বিনয়-নম্রতায় পরিপূর্ণ, সর্ব্বোপরি রঘুনাথের সরল শান্তভাষার বিশ্বমোহিনী শক্তি,—ইহাতে বাদসাহের হৃদয়ে অকৃত্রিম বাৎসল্যভাবের সৃষ্টি হইল! তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে-পরিপ্লুত হইল। রঘুনাথের করুণ-বাক্যে তাঁহার চিত্ত একবারেই বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বাৎসল্য-ভাবের আবেগে কান্দিয়া ফেলিলেন। অশ্রুজলে শ্মশ্রুরাশি পরিপ্লুত হইল। তিনি বলিলেন, "রঘুনাথ বাস্তবিকই তুমি আমার পুত্রতুল্য। তোমাকে আমি অদ্যই কারামুক্ত করিতেছি। কিন্তু একটা কথা এই যে তোমার জেঠা এত নির্ব্বোধ যে, তিনি আট লক্ষ টাকা মুনাফা পাইতেছেন, আমি কি তার ভাগী নই? আমাকেও তো কিছু দিতে হয়? আমি তোমাকে আর কারাক্লেশ দিব না। তুমি বাড়ী যাও, তোমার জেঠাকে আমার সহিত একবার দেখা করিতে বলিবে। তাঁহার উপরেই সমস্ত বিষয়ের ভার। তিনি যাহা ভাল বোধ করেন তাহাই করুন।" বাদসাহ এই বলিয়া রঘুনাথকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিয়া পরমাদরে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ বাড়ীতে আসিলেন, জেঠা মহাশয়কে সমস্ত কথা বলিয়া বাদসাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথের প্রযত্নে সমস্ত কলহের শান্তি হইল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কহিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ কহে আজি হৈতে তুমি আমার পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার জেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥
যাহ তুমি তোমার জেঠা মিলাহ আমারে।
যেমত ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে॥
রঘুনাথ আসি তবে জেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল॥

রঘুনাথের দ্বারা তাঁহার পিতা ও জেঠাকে এই বিপদ হইতে [illegible] করা শ্রীভগবানের এক ভঙ্গ। এই সকল গোলযোগ প্রশমিত [illegible] পর্য্যন্ত তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বিপদে ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিতে আর চেষ্টা করিলেন না, এইরূপে আরও অনেক দিন কাটিয়া গেল। গোল-যোগ প্রশমিত হইল। রঘুনাথ তখন শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ দেখিবার জন্য আবার উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তখনও তিনি মনের সমগ্র ভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেন না। তখনও তিনি কিয়ৎপরিমাণে বিষয়ীর [illegible] করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পাণিহাটীর মহোৎসব।

এই সময়ে পাণিহাটী গ্রাম শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাগমনে আনন্দ মগ্ন হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে প্রেমবিহ্বল পার্ষদগণ লইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ যখন গৌড়দেশে শুভাগমন করিলেন তখন এ দেশে প্রেমানন্দের যে তরঙ্গ বহিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তিন মাস কাল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটী গ্রামে অবস্থান করিয়া উক্ত গ্রামখানিকে বৈষ্ণবের পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাণিহাটী গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর যে মহা প্রেমময়ী শ্রীকীর্ত্তন লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতীব অদ্ভূত। উহা পাঠ করিলে বোধ হয় ঐ তিনমাস কাল জাহ্নবী তটবর্ত্তী পাণিহাটীগ্রাম প্রকৃতই যেন গোলোকের আনন্দ-সুধায় পরিপ্লুত হইয়াছিল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতেঃ-

"রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥"
"নিরন্তর পরমানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।"
"যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে।"
"যতেক আছিল প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার।"
"নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥"
"যে ভক্তি গোপীগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে।"

"কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডাগে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে।
কেহ কেহ প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলে হরি হরি॥
কেহ বা গুবাকবনে যায় নড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম বল।
তৃণ প্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥"
"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় যত যত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহাবৃক্ষ ধরি ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
মঞ্জিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
"মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥"
"এইরূপ পাণিহাটী গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নিত্য বহি নাহি আর॥

পাণিহাটী গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক ॥”

রঘুনাথ অচিরেই পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভাগমন সংবাদ পাইলেন। তিনি তখন আর বালক নহেন। বিষয়ের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং অনেক টাকা সঙ্গে লইয়া তিনি মহোৎসব দর্শন করিতে পাণিহাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণিহাটী কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী। রাজধানী হইতে ৪।৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। সপ্তগ্রাম হইতেও পাণিহাটী অধিক দূরে নহে। রঘুনাথ পাণিহাটী গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই গঙ্গাতটে শ্রীকীর্ত্তন কোলাহলের তুমুল নাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বিপুল ইষ্টক-বেদিকাসমন্বিত বটবৃক্ষমূলে প্রেমময় কলেবর তেজঃপুঞ্জবৎ এক অবধূত উপবিষ্ট। (এই বটবৃক্ষ ও বেদিকা এখনও বর্ত্তমান।) আর তাঁহাকে ঘেরিয়া মঞ্চের উপর ও নিম্নভাগে বহু কীর্ত্তনীয়া ও ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রভাব দেখিয়া রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন। তিনি দূর হইতেই ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। পাণিহাটী রঘুনাথের শাসিত মুলুকের অন্তর্ভুক্ত স্থান। সুতরাং রঘুনাথকে সকলেই চিনিতেন। রঘুনাথের শ্রীগৌরভক্তি কাহারও অবিদিত ছিল না। প্রণত রঘুনাথকে দেখাইয়া একজন ভক্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন, “প্রভো অই দেখুন রঘুনাথ উপস্থিত। রঘুনাথ আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন।” যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

পাণিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় ক'রে ॥
তলে উপরে ভক্তগণ হয়েছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চাহিয়া দেখেন রঘুনাথ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছেন। তিনি তখন রঘুনাথকে যেরূপ কথায় সম্ভাষণ করিলেন এবং যাহা বলিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোরে করিব দণ্ডন॥

রঘুনাথকে দয়াময় প্রভু নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ দীনের দীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি বিষয়ী, সংসারের কীট, কি করিয়া প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইবেন? কৌতুকী নিত্যানন্দ তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় নিজের সুশীতল চরণকমল ধারণ করিলেন। হরি হরি, এমন সৌভাগ্যও কি জীবের হয়! কিন্তু রঘুনাথ তো আর প্রাকৃত জীব নহেন। রঘুনাথ প্রেমময়ের শ্রীচরণকমল স্পর্শে বিবশ হইয়া পড়িলেন, তিনি তখন ভূলোকে কি গোলোকে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ রঘুনাথের প্রতি এইরূপে কৃপা করিয়া কৌতুক-সহকারে বলিতে লাগিলেন :—

চোরা, তুমি দূরে দূরে থাক, তুমি আমায় দেখা দাও না। আজ তোমাকে নিকটে পাইয়াছি, এখন ইহার উপযুক্ত দণ্ড করিব। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু বোলে তিঁহ নিকটে না কর গমন।
আকর্ষিয়া তার শিরে ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে॥

প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথকে "চোরা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? কেননা, দয়ালনিতাই বড় কৌতুকী। চোর কাহাকে বলে? যে পরের ধন অপ্রকাশ্যে গ্রহণ করে এবং তাহা গোপনে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে সেই চোর। রঘুনাথের অন্তর কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু

তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে লোক দেখান বৈরাগ্য গোপন করিয়া প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অন্তর প্রেমধন গোপন রাখিয়া,—যাঁহাদের ধন তাঁহাদের নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া,—এখন বিষয়ীর প্রায় বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্নিত্যানন্দ জানেন, রঘুনাথ যে বিষয়ীর বেশে বিচরণ করেন, উহা তাঁহার ছদ্মবেশ, উহা প্রেমভক্তি লুকাইবার বহিরাবরণ মাত্র। তিনি প্রভুর অতি নিজজন। অথচ তাহা সত্ত্বেও তিনি পিতার ভয়ে চোরের ন্যায় দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। কৌতুকী প্রভু তাই বলিলেন "চোরা তুমি দূরে দূরে থাক, আজ নিকটে পাইয়াছি। আজ তোমার দণ্ড না করিয়া ছাড়িব না।"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমভক্তি চোরা রঘুনাথের প্রতি যে দণ্ডাদেশ করেন, সে দণ্ড অতি শুভ দণ্ড। সে দণ্ড প্রসাদের বর্ণনা শুনিলে শুষ্ক রসনাও সরস হইয়া উঠে। মনে হয় অন্ততঃ এই দণ্ড প্রসাদ দর্শনের জন্যও সে সময়ে জন্ম না হইল কেন?

দণ্ডমহোৎসব।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমদ রঘুনাথের প্রতি যে দণ্ডাদেশ করেন তাহা এই :—

"দধি চিড়া ভক্ষণ করাও মোর গণে।"

রঘুনাথ এই দণ্ডাদেশ শুনিয়া কৃপাদণ্ড বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া বিপুল আয়োজনে এই শুভ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথ সংসারাশ্রমে যদি কোন শুভ ব্যাপার করিয়া থাকেন, তবে তাহা এই। তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে এই মহামহোৎসবই একমাত্র উৎসব। প্রভুর কৃপাদেশ প্রাপ্তি মাত্র রঘুনাথ ভক্ষ্য দ্রব্যাদির জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইলেন। তিনি মুলুকের মালিক। তাঁহার আদেশমাত্র দশদিকে লোক প্রেরিত হইল। চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ চিনি কলা ও মৃৎপাত্রাদি ভারে ভারে পাণিহাটীতে প্রভুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। মহোৎসবের নাম শুনিয়া চারি-

দিক হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইল। এমন কি ব্রাহ্মণ সজ্জন-গণও শুভাগমন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন॥

শত শত কলসে দুগ্ধ, শত শত ভারে দধি, স্তুপে স্তুপে চিনি সন্দেশ চিড়া ও কদলী ফল প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ব্রাহ্মণগণ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুগ্ধ চিড়া ও দধি চিড়ার আয়োজন হইল। পর্ব্বত-পরিমিত চিপিটকের স্তুপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক গরম দুগ্ধে ও অপর অর্দ্ধেক জলে ভিজান হইল। জল-ভিজান চিড়া দধি চিনি ও কলা দিয়া ছানিয়া মালসায় মালসায় সজ্জিত করা হইল। আর দুগ্ধে ভিজান চিড়া ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধে চাপাকলা চিনি ঘৃত ও কর্পূর সহযোগে ছানিয়া পৃথক শত শত মালসায় রাখা হইল। ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত হইলে পর, ভক্তগণের উপবেশনের বন্দোবস্ত হইল।

প্রভু পিড়ায় উপবেশন করিলেন। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ধনঞ্জয় জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস হোড় ও উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি প্রভুর অসংখ্য নিজজনগণ চবুতরায় উপবেশন করিলেন। মহোৎসবের সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন। মর্য্যাদা সংরক্ষক পরম দয়াল প্রভু তাঁহাদিগকেও আদর করিয়া উপরে বসাইলেন। অপরাপর লোক চবুতরার নীচে সমতল স্থানে উপবেশন করিলেন। কিন্তু স্থানের সঙ্কুলান হইল না। গঙ্গাতীরে, এমন কি তীরের নীচে গঙ্গার গর্ভে ও গঙ্গার জলেও লোক সকল প্রসাদ পাইবার আশায় দণ্ডায়মান হইল। সকলের জন্যই দধি চিড়া ও দুগ্ধ চিড়া দুই দুই মালসায় সজ্জিত হইল। কুড়িজন লোক পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

এমন সময়ে পাণিহাটীর সুবিখ্যাত ভক্ত রাঘব পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দণ্ড মহোৎসবের ঘটা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার আলয়ে প্রভুর সেবার কথা ছিল। তিনি আসিয়া মহামহোৎ-সবের বিপুল আয়োজন দেখিয়া বলিলেন "প্রভু একি ব্যাপার। এখানে উৎসব করিতেছ, ঘরে যে প্রসাদ রহিয়াছে।" প্রভু উত্তর করিলেন রাত্রিতে তোমার ঘরে ভোজন করিব। আর জান কি, আমি নিজে গোপজাতীয়, আমার সঙ্গে যাহাদিগকে দেখিতেছ ইহারাও গোপ। পুলিন-ভোজনে আমার বড় সুখ হয়। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
বড় সুখ পাই আমি পুলিন-ভোজন রঙ্গে॥

এই বলিয়া রাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে দুই মালসা দিলেন। সকলের পাত্রই ভোগদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন পরম রঙ্গী দয়াল নিতাই মহাপ্রভুকে ধ্যানযোগে আহ্বান করিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে শুভাগমন করিলেন। দয়াল নিতাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক স্থলীর নিকটে গিয়া এক এক গ্রাস তুলিয়া তুলিয়া অপরের অলক্ষিত ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল প্রদান করিতে লাগিলেন, মহা-প্রভুও চিড়ার গ্রাস তুলিয়া লইয়া নিতাইর বদনে প্রদান করিলেন। দুই একজন ভাগ্যবান ব্যতীত অপর কেহ মহাপ্রভুর দর্শন পাইল না। ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রকটন বা অপ্রকটন করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। রাসলীলাতে তিনি সহসা অন্তর্হিত হইলেন। নিজের অতি প্রিয়জন ব্রজবধূগণও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সর্ব্বত্র সদা বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥

যাহা হউক, নিতাইর রঙ্গ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং বৈষ্ণবগণ এই রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস॥

হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥
এই মত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাড়াইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥

ইহা ব্রজের ভাব। ইহা রাখালিয়া পুলিন ভোজন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মারও মোহ হইয়াছিল।

অতঃপর প্রভু নিতাই আপন আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দক্ষিণ দিকে চারি মালসা আরোয়া চিড়া মহাপ্রভুর জন্য স্থাপন করিলেন। সেই স্থানে অপরের অলক্ষিত ভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ হইল। নিতাই সকলকে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে আদেশ করিলেন। গঙ্গাপুলিনে তখন তুমুল হরিধ্বনি উঠিল, আর ভক্তগণ প্রেমানন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। শ্রীল রামদাসাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরকেই যমুনাপুলিন বলিয়া মনে করিলেন। সকলের শেষে শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের ভুক্তশেষ প্রসাদ পাইয়া পরম চরিতার্থ হইলেন।

ইহাকে "দণ্ড মহোৎসব" বলিতে হয় বলুন, "চিড়া মহোৎসব" বলিতে হয় তাহাই বলুন, কিন্তু আমার মনে হয় ইহার প্রকৃত নাম "পুলিন ভোজন" মহোৎসব। এই মহোৎসবের বিবরণ পাঠে শ্রীমদ্ভাগবতের সেই বিস্ময়করী লীলার বিবরণ মনে হয়, যমুনাপুলিনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর যজ্ঞের অগ্রান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রাখাল-বেশের ও রাখাল-ভোজের বর্ণনা মনে পড়ে।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্য রুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ
বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রেচ কক্ষে।
বামেপাণৌ মসৃণ কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু॥

তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরি সুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ।
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ॥

অর্থাৎ সকলে পরস্পর স্বীয় স্বীয় খাদ্যদ্রব্যের পৃথক পৃথক আস্বাদ দেখাইয়া নিজে হাসিয়া এবং অপরকে হাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোমরে বাঁশীটী গুঁজিলেন, বাম কক্ষে শৃঙ্গবেত্র আকুঁড়িয়া ধরিলেন, বামহস্তে দধিমাখা ভোজ্যদ্রব্যের কবলপাত্র ধারণ করিলেন, অঙ্গুলীর সান্ধর মধ্যে পিলু প্রভৃতি ফল লইয়া সকল রাখালের মধ্যে পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় অবস্থান করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। আর পরিহাস বাক্যে সকলকেই হাস্য করাইতে লাগিলেন। স্বর্গ ও মর্ত্তবাসী ব্যক্তিগণ যজ্ঞভুক্ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে কত উপাসনা করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করেন, রাখালগণ সহ যমুনাপুলিনে তাঁহার এই বন্যভোজন প্রকৃত্ই এক মহাশ্চর্য্য দৃশ্য।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিনের সেই পুলিন-ভোজনের অভিনয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম প্রচার করিলেন। শ্রীমদ্ রঘুনাথের চিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমপ্রবাহে পরিসিক্ত হইয়া উঠিল। অকৈতব শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ ভিন্ন মহাপ্রভুর প্রিয়জন হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীরঘুনাথের যে দণ্ড করিলেন, সে দণ্ডের অপর নাম মহাকৃপা। আর এখানে যে মহোৎসব হইল, সে মহোৎসব পুলিনভোজন অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির এক অপূর্ব্ব সাধন। এইরূপ মহোৎসবে ব্রজ প্রেমের উদয় হয়। ভাগ্যবান্ রঘুনাথের হৃদয়ে এই উপলক্ষে ব্রজরসের প্রথম প্রবাহ প্রবাহিত হইল। রঘুনাথ সেদিন পাণিহাটীতেই রহিলেন।

এইরূপে মহানন্দে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে রাঘব-মন্দিরে শ্রীকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমানন্দময় নর্ত্তনে সকলেই মহাপ্রেমে প্রমত্ত হইলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু অপরের অলক্ষিতভাবে নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। নৃত্য অন্তে ভোগের আয়োজন হইল। দক্ষিণ দিকে মহাপ্রভুর আসন সন্নিবেশ করা হইল। প্রভু নিতাই ও রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। কিন্তু

অপরের নিকট তিনি অপ্রকট রহিলেন। রাঘব পণ্ডিত প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অপর ভোজ্য গ্রহণ করিতেন না। ইতঃপূর্ব্বেও বহুবার তিনি ভোগ প্রস্তুত করিয়া ধ্যানযোগে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছেন। রাঘবের ঘরে মহাপ্রভুর ভোগ অতি অপূর্ব্ব, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাঞা পান সন্তোষ অপার॥

দুই ভ্রাতার ভোগ হইল। পরম দয়াল রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে দুই ভ্রাতার অবশিষ্ট পাত্র প্রদান করিলেন। রঘুনাথ সেই প্রসাদ পাইয়া প্রেমে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে পাণিহাটীর দণ্ড মহোৎসব ও রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইল।

এই দুই শুভ মহোৎসব এখনও জ্যৈষ্ঠের শুক্লাত্রয়োদশীতে পুণ্যভূমি পাণিহাটীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ত্রয়োদশী স্বভাবতঃই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ভক্তিময়ী তিথি। তাহাতে শুক্লাত্রয়োদশীর মাহাত্ম্য আরও অধিক এই পুণ্য তিথির পুণ্য মহোৎসব ভক্তগণের প্রেম লাভের প্রকৃতই এক মহাসাধন। সেই জাহ্নবী তটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রাম এখনও বিরাজমান. পতিতপাবনী জাহ্নবী এখনও পাণিহাটীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন. এমন কি সেই ইষ্টক-বেদিকা বাঁধা বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান, এখনও জ্যৈষ্ঠের শুক্লত্রয়োদশীতে আমাদের পূজনীয় শ্রীল দাস গোস্বামীর নামে দণ্ড মহোৎসব ও শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে প্রভুর ও ভক্তের লীলাস্থান জীবের পক্ষে মহা সম্পদ। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে এখনও আমরা এই লীলাস্থলী দর্শন করিতে পাই।

কৃপাভিক্ষা।

পরদিন প্রাতে দয়াময় প্রভু নিতাই গঙ্গাস্নান করিয়া আবার সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। রঘুনাথ সেইখানে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন প্রভুর চরণে আমার একটী নিবেদন আছে। তিনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহার চরণে একটা কথা বলিতে চাহি। আমি নিজে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছি না। রাঘব পণ্ডিত প্রভুর নিকট রঘুনাথের অভিলাষ জানাইলেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়া শ্রীল রঘুনাথ বলিলেন. যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য চরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুইজন রাখেন বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়
তুমি কৃপা করিলে তাঁরে অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দাও গোসাঞি হইয়া সদয়।
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাও কর আশীর্ব্বাদ॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথ মহাপ্রভুর শ্রীচরণলাভের জন্য বহুবার বহু প্রকার প্রয়াস পান, কিন্তু নানা প্রকার বিঘ্নবিপত্তি তাঁহার অভীষ্টলাভে বাধা জন্মায়। প্রকৃত কথা এই যে ইষ্টলাভ সহজে হয় না। ঐহিক ইষ্টলাভ করিতে হইলেও অনেক অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। পার মার্থিক ইষ্টলাভ অপেক্ষা প্রধানতম লাভ জীবের আর অন্য কিছুই নাই। বলুন [illegible] ন আমি আর [illegible] না জানি —আমি নিতান্ত

অযোগ্য। বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে আশা করে, পঙ্গু যেমন পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে আশা করে, শ্রীচৈতন্য চরণ লাভের জন্যও আমার সেই প্রকার দুরাশার উদয় হইয়াছে। কত চেষ্টা করিলাম, কতবার গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে বিঘ্ন আরও বাড়িয়া চলিল কিছুতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমি এখন বুঝিয়াছি, তোমার কৃপা না হইলে মানুষ স্বীয় চেষ্টায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ লাভ করিতে পারে না। আর তোমার কৃপা হইলে অধম অভাজন অযোগ্যজনও অনায়াসে সেই শিব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত রাতুল চরণ অনায়াসে লাভ করিতে পারে। আমি নিতান্ত অযোগ্য। তোমার চরণে মনের কথা নিবেদন করিতে ভয় হয়। কিন্তু প্রভো তুমি পরম দয়াল তাই সাহসে ভর করিয়া বলিতেছি গোসাঞি, দয়া করিয়া আমায় চৈতন্য চরণ মিলাইয়া দাও। আমার মাথায় তোমার শীতল রাতুল চরণ রাখিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি নিরাপদে শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিতে পারি।"

রঘুনাথের এই দীনতাপূর্ণ সকাতর প্রার্থনা ভক্ত হৃদয়ের অতি স্বাভাবিক উক্তি। ভক্ত জানেন গুরুকৃপা ব্যতীত শ্রীভগবদ্ লাভ হয় না। কি যোগ, কি জ্ঞান, কি ভক্তি—সকল প্রকার সাধনাতেই গুরুকৃপার প্রয়োজন। এই জন্য উপনিষদ বলিতেছেন:—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং আচার্য্যবান পুরুষো বেদ।'

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত শিষ্য,—আর কিছু না হউক—অন্ততঃ পক্ষে সমিৎ হস্তে করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। গুরুর শরণাগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকার জন্মে। ফলত শ্রীগুরুর পদাশ্রয় ভিন্ন ইষ্টলাভের অপর উপায় নাই।

অপর কথা এই যে শ্রীচৈতন্যচরণ লাভের প্রধানতম সাধন শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করা। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও বহুস্থলে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস স্পষ্টতঃই বুঝিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের ভাণ্ডারী। তাঁহার কৃপাভিন্ন শ্রীগৌর চরণ লাভ অসম্ভব। তাই তিনি নিতাইর রাতুল চরণ শিরে ধরিয়া

সকাতরে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কৃপায় নিরাপদে আমার শ্রীচৈতন্য চরণ লাভ হয়।"

পরম দয়াল নিতাই রঘুনাথের আর্ত্তি শুনিয়া একটু হাসিলেন। প্রভুর হাসির কারণ এই যে তিনি ভাবিলেন, শ্রীগৌর-লীলার মহিমা প্রকৃতই অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত। যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরসমঞ্জরী (বা রতিমঞ্জরী) তাঁহার এ আর্ত্তি কেন? লীলাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি প্রচার করার জন্য কি অদ্ভুত ভাবই প্রকট করিলেন! তখন তিনি হাস্য ও মনের ভাব সংবরণ করিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন "তোমরা সকলেই জান, রঘুনাথের বিষয়-সুখ দেবরাজ ইন্দ্রের সুখ তুল্য। কিন্তু মহাপ্রভুর এমনি কৃপা যে, সে সুখ ইহার নিকট সুখ বলিয়াই বোধ হয় নাই। তোমরা সকলে আশী-র্বাদ কর, রঘুনাথের যেন শ্রীচৈতন্য চরণ লাভ হয়। যে জন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম গন্ধ একবার মাত্রও প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মলোকের সুখও তাহার নিকট প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তম শ্লোকলালসঃ॥

অর্থাৎ, রাজা ভরত উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের চরণ অভিলাষী হইয়া যৌবন অবস্থাতেই হৃদয়ের অতি প্রিয় পদার্থ দারাসুত সুহৃদ্ রাজ্য প্রভৃতি মলের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীভগবানে রতি জন্মিলে আর কিছুতেই আসক্তি থাকে না।

এই বলিয়া পরম দয়াল প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন এবং অতীব স্নেহসহকারে বলিলেন—

তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবেন সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ॥

ইহা হইতে আশীর্বাদ আর কি হইতে পারে? ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রীতে একবার হরিধ্বনি করুন। এমন পরম কারুণিক প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় না করিলে কি এমন সুনিশ্চিত আশ্বাসবাক্য সহসা লাভ করা যায়? "শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার উদ্ধার করিতে স্বয়ং আসিয়াছিলেন, তোমার বন্ধন ছুটিয়া গে[illegible] তোমাকে স্বরূপের স্থানে সমর্পণ করিবেন, তাঁহার স্বীয় চরণে তোমা[illegible]রঙ্গ ভৃত্য করিয়া রাখিবেন। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে যাও[illegible] নির্বিঘ্নে শ্রীগৌরাঙ্গের রাতুল চরণ লাভ করিতে পারিবে।' [illegible] গুরুর কার্য্য, ইহাই গুরুর আশ্বাসবাণী। শাস্ত্র বলেন:—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরম গুরু প্রভু নিতাই শ্রীমদ্ রঘুনাথকে কৃপা করিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন। রঘুনাথের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হইল। হৃদয়ের আশা সম্পুষ্ট ও বলবতী হইল। প্রভুর অজ্ঞাত অবস্থায় শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণ-পূজনের জন্য প্রভুকে না জানাইয়া প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে শ্রীমদ্ রঘুনাথ একশত মুদ্রা ও সাত তোলা সোণা প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলেন। তাঁহার ভৃত্য ও আশ্রিত সহচরগণের চরণে প্রণামীস্বরূপ আরও একশত টাকা ও দুই তোলা সোণা শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর সকলের চরণ বন্দনা করিয়া সানন্দচিত্তে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় পরম কৃতার্থ হইলেন।

মহোৎসবের ব্যয়।

পাণিহাটীর দণ্ডমহোৎসবে শ্রীমদ্ রঘুনাথ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ভক্ষ্য দ্রব্যাদির খরচ বাদেও প্রণামী স্বরূপই তিনি বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন, যথা,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রণামী একশত টাকা এবং সাত তোলা সোণা, শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের প্রণামী একশত টাকা এবং দুই তোলা সোণা, এবং প্রভুর অনুচর সহচর ও আশ্রিতবর্গের প্রণামীর জন্যও ব্যক্তিবিশেষে কাহাকে দুই, কাহাকে পাঁচ, কাহাকে দশ, কাহাকে বার, কাহাকে পোনর এবং কাহাকে বা বিশ টাকা পর্য্যন্ত প্রণামী প্রদান করা হয়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :-

> যুক্তি করি শতমুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
> নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে॥
> তারে নিষেধিলা প্রভুকে এবে না কহিবে।
> নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবে॥
> * * * *
> একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা দ্বয়।
> পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়।
> * * * *
> প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন
> পুজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ॥
> পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয়।
> মুদ্রা দেই বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়॥
> সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
> যার নামে রাঘব যত চিঠি লেখাইলা॥

প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের ভৃত্য ও আশ্রিতগণের সংখ্যা প্রচুর। দুই টাকার কম কাহাকেও দেওয়া হইযাছিল না, ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা বিচারে ২০৲ টাকা পর্য্যন্তও দেওয়া হইয়াছিল। এই দণ্ড মহোৎসবে প্রণামী স্বরূপই শ্রীমদ্ রঘুনাথের কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, একবার সহৃদয় পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন

এখন কথা এই যে শ্রীমদ্ রঘুনাথ যখন পাণিহাটীতে আগমন করেন, তখন তাঁহার সংসার-আসক্তি সম্বন্ধে তাঁহার পিতামাতার মনে দৃঢ়তর সন্দেহ জন্মিয়াছিল কি না? পাণিহাটী আগমনের পূর্ব্বে তিনি বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন কি না? বোধ হয়, তখনও তিনি মহা-প্রভুর আদেশে বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা বা জ্যেষ্ঠতাতের চিত্ত রঘুনাথের বৈরাগ্য-নিবৃত্তি বিষয়ে একরূপ আশ্বস্ত হইয়া-ছিল। রঘুনাথের হস্তেই তখন বিষয়ভার সমর্পিত ছিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতিক্রমে রঘুনাথই সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং পাণিহাটীতে আগমন ও মহোৎসবের অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে রঘুনাথের কোনও প্রতিবন্ধ ছিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

পুনর্ব্যাকুলতা ও ভীষণ বাধা।

পুণ্যভূমি পাণিহাটী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে রঘুনাথের বাহ্যভাবে আবার পরিবর্ত্তন প্রকাশ পাইল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমাশীর্ব্বাদ পাইয়া রঘুনাথের বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির প্রবাহ আর বাহ্য বাধা মানিল না। তিনি অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডী মণ্ডপে শয়ন করিয়া থাকিতেন। প্রিয়তমা প্রণয়িণী পত্নী তাঁহার বিরহে আবার জগৎ শূন্যময় বলিয়া বোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে রঘুনাথের নিকট সকলই বিষবৎ বলিয়া বোধ হইল। তিনি আবার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আবার দিবানিশি অনাহারে অনিদ্রায় হা গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উন্মুক্ত গগনে বিচরণশীল পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় দিবানিশি পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। পাণিহাটী গমনের পূর্ব্বে রঘুনাথ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের

কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তির পরে তাঁহার বিষয়ে বিরক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল, এমন কি অন্তঃপুরে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইল, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে :—

সেই হইতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন॥

আবার তিনি পলাইতে নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে তিনি প্রকৃতই পলায়ন করিলেন। কিন্তু আবার সন্ধান করিয়া ধরিয়া আনা হইল। সুবিধা পাইলেই রঘুনাথ পলায়নের চেষ্টা করিতেন, আর তাঁহার অভিভাবকগণ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেন।

ইহাতে মাতার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার নয়নমণি অঞ্চলের ধন কোন্ মুহূর্ত্তে চিরদিনের জন্য পলায়ন করিবেন, স্নেহময়ী জননী তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অবশেষে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন বাঁধিয়া না রাখিলে রঘুকে বুঝি আর রাখা যাইবে না। মনের কথা পতিকে খুলিয়া বলিলেন,—"রঘু বাতুল হইয়াছে, উহাকে শুধু প্রহরীর অধীনতায় রাখিলে চলিবে না, বাঁধিয়া না রাখিলে রঘুকে রাখা যাইবে না।" ইহা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন, "ইন্দ্রের বৈভব তুল্য ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরার ন্যায় স্ত্রী যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, সামান্য দড়ীর বন্ধনে তাহাকে আমি কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিব? প্রারব্ধ খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। রঘুনাথ সাধারণ পাগল নহে। তাহা হইলে উহার চিকিৎসা চলিত, বান্ধিয়া রাখিলেও রাখা যাইত। রঘুর প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে। রঘু তাঁহারই নামে উন্মত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বাউলকে দড়ীর বাঁধনে কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

এই মত বারে বারে পলায়, ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতা স্থানে॥
পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা বলে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া।

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ীর বন্ধনে তাঁরে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাঁরে।
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে॥

যে সন্তানের কুসুমকোমল পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে জননী অধীর ও অস্থির হয়েন, নিজে শতগুণে অধিকতর কষ্ট বোধ করেন, সেই জননী পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বাৎসল্যের কি অদ্ভুত ভাব! মা মনে করিলেন, রঘু বাতুল হইয়াছে। নচেৎ কি এই সুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় বাহিরে পড়িয়া থাকে এবং পলা-ইয়া যাইতে চায়? রঘু কেন বাতুল হইল, রঘুর বাতুলতার লক্ষণ কি, মায়ের কোমল প্রাণে সে বিচারশক্তি আসিল না। কিন্তু পিতা রঘুর এই বাতুলতার লক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। রঘু হা গৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দিন যামিনী বিভোর, রঘু শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে উন্মত্ত। পিতা বুঝিলেন, তাঁহার স্নেহের তনয় এখন আর তাঁহার নহেন। রঘু শ্রীগৌরাঙ্গের। শ্রীগৌরাঙ্গের বাউলকে তিনি কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন? সুতরাং রঘুনাথকে বাঁধিয়া রাখা হইল না। কিন্তু আবার প্রহরী রাখার বন্দো-বস্ত হইল। রঘুনাথ প্রায়শঃই রাত্রিতে পলাইতেন। এই জন্য প্রহরী দিগকে রাত্রিতে জাগিয়া থাকিবার আদেশ করা হইল। উহাদের এক-দল দিনে ঘুমাইত, এবং রাত্রিতে রঘুর পার্শ্বে বসিয়া জাগিয়া থাকিত। এই প্রকারে প্রহরীগণ রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে:—

তাহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥

উদ্ধারের উপায়

রথযাত্রার সময়ে প্রতি বর্ষই গৌড়ীয় ভক্তগণ গৌরচন্দ্র ও নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতেন। রথযাত্রার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণ নীলাচলে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেন। ভক্তগণ সমবেত হইয়া শ্রীকীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে নীলাচলে গমন করিতেন। সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রঘুনাথ একবার মনে করিলেন তিনি এবার যে প্রকারেই হউক যাত্রীদের সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন। আবার মনে করিলেন, তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। যাত্রীরা যে পথ দিয়া গমন করেন, তাহা সকলেরই বিদিত। ইহাদের সঙ্গে গেলে আবার ধরা পড়িতে হইবে। সুতরাং এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। যাত্রীরা চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ অস্থির ও উৎকণ্ঠিত ভাবে দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ চিন্তা করিয়া পলাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। জীবের সাধন ও শ্রীভগবানের কৃপা এই উভয়ের একত্র সম্মিলনে ফলসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। রঘুনাথ এতদিন ব্যাকুল প্রাণে প্রাণেশ্বরকে ডাকিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার ফলসিদ্ধি ঘটে নাই। অবশেষে শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রেমাশীর্ব্বাদে তাঁহার ব্যাকুলতাময়ী ভক্তি যখন চরমসীমায় উপস্থিত হইল, তখন শ্রীভগবান রঘুনাথের বন্ধন মোচনের এক অভিনব অদ্ভুত উপায় করিয়া দিলেন। সে উপায় এই :—

এক দিবস রঘুনাথ রাত্রিতে দেবীমণ্ডপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। নিদ্রা কাহাকে বলে, অনেক দিন রঘুনাথ তাহা জানেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে তিনি কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন নীরবে তাহার নাম লইয়া হাহাকার করিতেছেন। আর ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া দেহ ধূসরিত করিতেছেন। নয়নজল কখনও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কখনও বা শ্রাবণের ধারার ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাত্রি দুপ্রহর অতিবাহিত হইল। রক্ষকগণ রঘুনাথকে নিদ্রার জন্য কত অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু রঘুনাথের নিদ্রা নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাময় আর্ত্তনাদে রক্ষকদিগের হৃদয়ও উতালা হইয়া উঠিতেছে। তিন প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইল। রঘুনাথ একই ভাবে

রাত্রি কাটাইতেছেন। রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল। তথনও ইহারা রঘুনাথের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছে, কত প্রকার বুঝাইতেছে, কিন্তু রঘুনাথের ব্যাকুলতায় সকল উপদেশই ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভাত হইবার দণ্ডচারি পূর্ব্বে হঠাৎ আঙ্গিনায় একজন লোক আসিয়া রঘুনাথকে ডাকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ভক্তিভাবে আঙ্গিনায় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ইহাঁর নাম শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য। ইনি রঘুনাথের ইষ্টদেবতা ও কুলপুরোহিত এবং শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রাণ বাসুদেব দত্তের ও সবিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ইহাঁর পরিচয় আছে. যথাঃ —

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়।
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এইরূপ ঃ—

দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ।
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হন অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত।
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহ যবে দাঁড়াইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা।

শ্রীমদ্ যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয় শেষ রাত্রিতে আসিলেন কেন। তাহার একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার নিজ বাটীর শ্রীবিগ্রহের সেবা করিত। কয়েক দিন হইতে সে শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে যায় না। এই কয়েক দিন অপরাপর লোক দিয়াই তিনি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর-সেবার নিমিত্ত আর ব্রাহ্মণের যোগাড় করিতে না পারিয়া আচার্য্য মহাশয় মনে করিলেন, রঘুনাথের দ্বারা পূজরীকে সাধাইলে সে উহাঁর কথা উপেক্ষা করিতে পারিবে না

বেলা উঠিলে যদি সে অন্য কাজে অন্যত্র চলিয়া যায় এই মনে করিয়া আচার্য্য মহাশয় চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে রঘুনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই ঘটনা রঘুনাথকে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পূজরীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। রক্ষকেরা মনে করিল, যখন আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের সহিত রঘুনাথ যাইতেছেন, তখন আর পলাইবার আশঙ্কা কি? এই মনে করিয়া রক্ষকেরা সারা রাত্রির পরে একটু চক্ষু মুদিল। আর অমনি তাহারা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। আচার্য্য মহাশয়ের বাটী রঘুনাথের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে। উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। আচার্য্যের বাড়ী ছাড়াইয়া কিয়দ্দূরে পূজরীর বাড়ী। আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর নিকট আসিয়া রঘুনাথ কহিলেন, "আপনি আর কেন উহার বাড়ী যাবেন, আপনার পূজরী পাইলেই ত হইল, আমি যাইতেছি আপনি স্নান করুন।"

উদ্ধার-লাভ।

আচার্য্য মহাশয় সরল প্রকৃতির লোক। রঘুনাথের কথার ভঙ্গি ও মনের ভাব তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিলেন। রঘুনাথ দেখিলেন, ইহা অপেক্ষা অনুকূল সময় তাঁহার জীবনে আর ঘটিবে না। গুরুদেব কৃপা করিয়াই তাঁহাকে প্রহরীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, এ সুবিধা তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। তখনও প্রভাত হয় নাই, তখনও কুহেলী আধার রহিয়াছে, দুই একটী পাখী প্রভাতের আগমন সূচনা করিতেছে মাত্র। নগরে তখনও কেহ জাগে নাই। রঘুনাথ পূর্ব্বদিকে চলিলেন, আর ভয়ে ভয়ে এক একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যতই পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, রঘুনাথ, "জয় গৌরাঙ্গ জয় নিতাই" বলিতে বলিতে অধিকতর দ্রুতগতিতে ও অধিকতর ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া বিপথে ও গ্রামের পথ ছাড়িয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথ রাজকুমার। পদব্রজে বিচরণ করার অভ্যাস তাঁহার অতি

কমই ছিল। সেই রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্দর্শনের জন্য অধীর হইয়া পথে ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দস্যুভীতি পথিকের ন্যায় ধাবিত হইলেন। উৰ্দ্ধশ্বাসে চলিবার সময়ে তিনি কতবার আছাড় পড়িয়াছিলেন, কতবার হুছুট খাইয়াছিলেন কতবার কণ্টকে তাঁহার কোমল দেহ ও কোমল চরণ হইতে শোণিতপাত হইতেছিল সে সকল কথা স্মরণ করিলেও চিত্তে মহাক্লেশের উদয় হয়। কিন্তু রঘুনাথের সে সকল ক্লেশের আদৌ অনুভূতি হয় নাই। তিনি পুনরায় ধরা না পড়েন, তিনি এবার নিরাপদে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণান্তিকে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইতে পারেন, এই তাঁহার একমাত্র ভাবনা। জল জঙ্গল, তৃণ, কণ্টক ও বালুকাভূমি প্রভৃতির উপর দিয়া রঘুনাথ উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠিত ভাবে ধাবমান হইলেন। যথা শ্রীভক্তমালে :—

> অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
> দিগ্বিদিক ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায়॥
> জল জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
> নাহি মানে. ধায় মাত্র বাতুলের পারা॥

বলা বাহুল্য, এইরূপ বিচরণে তাঁহার কুসুমকোমল পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইল। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি কায়মনোবাক্যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের চরণ চিন্তা করিতে করিতে ১৫ ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে এক গোয়াল-বাথানে উপস্থিত হইলেন। সহৃদয় গোপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিলেন। সেই দুগ্ধ পান করিয়া সে রাত্রিতে তথায় তিনি পড়িয়া রহিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

> শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া।
> পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
> গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
> কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য চরণে॥
> পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
> সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥

উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই পান করি তথায় পড়িয়া রহিলা ॥

প্রেমিক পাঠক, এখন একবার প্রেমের রীতি স্মরণ করুন। রঘুনাথের চিত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নবানুরাগে পূর্ণ। শ্যামসুন্দর-সন্দর্শনের জন্য শ্রীমতীর অভিসার ও গৌরসুন্দর-সন্দর্শনের জন্য রঘুনাথের এই উন্মত্তবৎ প্রয়াণ,—ঠিক একজাতীয় ক্রিয়া। এখানে এই উক্তির পোষকতার জন্য শ্রীল জ্ঞানদাস ও শ্রীগোবিন্দদাসের দুইটী অভিসারের পদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরজন ভয় কিছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ ॥
দেখ নব অনুরাগ রীত।
বন আন্ধিয়ারা ভুজগ ভয় কতশত
তুলহু না মানয়ে ভীত ॥
সখীগণ সঙ্গ তেজি চলি একেশ্বরী
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায় ॥
চললি কলাবতী অতিশয় বস-নবে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
মনহি উজরল কান ॥

শ্রীল গোবিন্দদাসের দিবাভিসারের পদটী এই :—

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়লু অভিসার ॥

হরি হরি প্রেম কি গতি অনিবার।
কানুক পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহু বিচার॥
গুরুজন নয়ন পাপিজন বারণ
মাঝত মণ্ডল ধূলি।
তাহিক মেলি চললি বর রঙ্গিনী
পন্থহি গেও সব ভূলি।
যত যত বিঘিনি জিতল অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দ দাস কহই হম সমুঝই
হরি সঞে রসময় তন্ত্র।

অভিসার প্রেম বেগের আতিশয্য প্রকাশক অভিসার বর্ণন অতি ও সুন্দর ও মনোরম। রঘুনাথের এই অভিসারও ব্রজসুন্দরীগণের পদবীতির অনুযায়ী। তাই ভক্তগণ চিনিতে পারিয়াছিলেন ইনি সাক্ষাৎ শ্রীরতিমঞ্জরী।

সুখের সংসারে শ্মশানের আগুণ।

রঘুনাথ বাড়ী হইতে ৩০ মাইল দূরে আসিয়া গোপ বাথানে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। আশা ও ভয় যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। এদিকে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই রঘুনাথের প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল, —ঘরে রঘুনাথ নাই। একজন রক্ষক অত্যন্ত ভীত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গেল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সেকি, রঘুনাথ এখনও বাড়ী যায় নাই?" আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন, —রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ অভিমুখেই প্রস্থান করিয়াছেন। সকলেই বুঝিতে পারিল, রঘুনাথ নীলাচল অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। অন্তঃপুরে হৃদয়বিদারি রোদনের করুণ রোল উঠিল, সমস্ত পল্লী শোকের বিষাদচ্ছায়ায় বিমান ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। চারিদিকে লোক ছুটিল। কেহ কোথাও রঘুনাথের অনুসন্ধান পাইল না। দক্ষিণ দিকের পল্লীতে পল্লীতে

লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু কেহই রঘুনাথের সন্ধান বলিতে পারিল না, এমন কি রঘুনাথকে কেহ দেখিতে পাইয়াছে এরূপ কথাও কেহ বলিতে পারিল না।

রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস মনে করিলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভু সন্দর্শনের জন্য নীলাচলে গমন করিতেছেন, সম্ভবতঃ রঘুনাথ তাহাদেরই সঙ্গে আছেন। ভক্তগণ যে পথে যাইতেন, সকলেই সে পথের খবর জানিতেন। গোবর্দ্ধন আর কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রীদের অগ্রণী,—তাঁহার সুপরিচিত শ্রীল শিবানন্দ সেন মহাশয়ের নামে অতীব বিনয়সহকারে একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপঃ—আমার পুত্র শ্রীমান্ রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য উন্মত্ত। রঘুনাথ আমাদের একমাত্র পুত্র,—অন্ধের নয়ন। ঘরে সোণার পুত্তলি বধূমাতা। রঘুনাথ এই সকল ত্যাগ করিয়া সকলকে শোকে ভাসাইয়া সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত নীলাচলে যাইতেছে। বাড়ীতে হাহাকার উপস্থিত, আমার সুখের সংসারে শ্মশানের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আপনি দয়াময়, আপনাকে বেশী লেখা বাহুল্য। দশজন লোক পাঠাইলাম। বাউলকে কৃপা করিয়া ইহাদের সঙ্গে বাটীতে পাঠাইয়া আমাদের জীবন দান করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।”

পত্র লইয়া দশজন লোক তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইল। তাহারা ঝাকড়াতে যাইয়া বৈষ্ণব যাত্রীদিগকে দেখিতে পাইল, শিবানন্দের হস্তে পত্র প্রদান করিল। শিবানন্দ বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, রঘুনাথ তাহাদের সঙ্গে নাই। রঘুনাথের সহিত তাঁহাদের দেখাও হয় নাই। লোকগুলি নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিল। গোবর্দ্ধনের বাড়ীতে আবার শতগুণ অধিক বেগে রোদনের রোল উঠিল। পতিগতপ্রাণা কুসুম-কোমলা বালিকা বধূ পতির শোকে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুর স্নেহময়ী জননী একবারেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, প্রতিবাসিনী রমণীগণও শোকে অধীর হইলেন, এমন কি ইঁহাদের সান্ত্বনা করার জন্য আসিয়া অন্যান্য রমণীগণও শোকে ও বিষাদে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সংসারের এমনই মোহমায়া! শ্রীবৃন্দাবনের ধনকে আপন

গৃহে পাইয়া পিতৃব্য ও পিতামাতা তাঁহাকে পুত্র বলিয়া এবং বালিকাবধূ তাঁহাকে আপন প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অপ্সরা সম রূপবতী বালিকাবধূ ও ইন্দ্রের বৈভবের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য রঘুনাথের নিকট সততই বিষবৎ বোধ হইত। রঘুনাথ পলায়ন করিয়া যেন পরিত্রাণ পাইলেন, অথচ রঘুনাথের পিতৃগৃহে শোকের শ্মশানবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু অচিরেই দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ রঘুর পরিত্যক্ত পরিজনগণের হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শান্তির শীতল বারি সিঞ্চন করিয়া এক অভিনব মধুর বৈরাগ্য ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের পরিবারস্থ ব্যক্তি-গণের চিত্ত-মধ্যে রঘুর বৈরাগ্য, রঘুর গৌরভক্তি রঘুর শ্রীগৌরাঙ্গ উৎকণ্ঠা শতমুখী গঙ্গার ন্যায় বিস্তারিত হইয়া পড়িল। রঘু কি পদার্থ, অচিরেই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা রঘুনাথকে ভাবিতে ভাবিতেই রঘুনাথের হৃদয়ের ধন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন। সুতরাং পার্থিব লোকের ন্যায় অধিক দিন তাঁহাদিগকে শোকজ্বালা ভোগ করিতে হয় নাই, এবং রঘু হইতে তাঁহারা পরমা ভক্তি লাভ করিলেন।

শ্রীক্ষেত্র-প্রাপ্তি।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গৃহ-কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যে প্রকার পথ-ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে শ্রীনীলাচলে উপস্থিত হয়েন, তাহাতে এক-দিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গূঢ় আকর্ষণী শক্তি, অপর দিকে রঘুনাথের অদ্ভুত উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

রঘুনাথ প্রথম দিনই পোনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন। তিনি রাজ পুত্র। পদব্রজে দূরপথে ভ্রমণের অভ্যাস আদৌ তাঁহার ছিল না। তাহার পরে পথের যে দুরবস্থা, পূর্ব্বেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গল,—জঙ্গলের মধ্যস্থ বা পার্শ্বস্থ কণ্টকাকীর্ণ পথ, কোথাও বা উত্তপ্ত বালুকারাশি, কোথাও বা কঙ্করপূর্ণ মাঠ। রঘুনাথের কুসুমকোমল চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া হয় ত রক্তধারা বহিতেছিল; তাহার উপরে আবার অনাহার ও মানসিক উদ্বেগ। এইরূপ ক্লেশ কেবল এক দিন দুই দিনের জন্য নহে, বারটী দিন রঘুনাথ এই প্রকার বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া নীলাচলে

উপস্থিত হয়েন। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-প্রাপ্তির আশায় ও উৎকণ্ঠায় দৈহিক কোন ক্লেশই তাঁহার নিকট ক্লেশ বলিয়া অনুভূত হয় নাই। এই বার-দিনের মধ্যে তিনদিন মাত্র রঘুনাথ দৈহিকধর্ম্মরক্ষার্থ নামমাত্র আহার্য্য মুখে দিয়াছিলেন। • যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:—

এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হৈঞা ছাড়িল সরাণ।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিলা পয়াণ॥
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য চরণ প্রাপ্তি মন॥
কভু চর্ব্বণ কভু রন্ধন কভু দুগ্ধ পান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখয়ে পরাণ॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন॥

রঘুনাথ এতদিন বিলাস-বৈভবপূর্ণ স্বীয় রাজাবাসে অবস্থান করিয়া যে দুঃসহ ক্লেশভোগ করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছিলেন, তাহার তুলনায় পথশ্রম, অনাহার ও পথে পথে নিদারুণ দৈহিক ক্লেশও তাহার নিকট বৈকুণ্ঠ-সুখ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। বাড়ী হইতে পলায়ন করার সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অধিক মাত্রায় ভয় ও অল্প অল্প আশার কিরণ উদ্ভাসিত হইতেছিল, এখন ক্রমেই তাঁহার ভয়ের মাত্রা কমিয়া আশার মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। প্রভুর আশ্বাসবাক্য তাঁহার মনে হইল। শ্রীমন্নিত্যা-নন্দের শুভাশীর্ব্বাদ বাক্য তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার আশা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। সুতরাং এত কষ্টেও রঘুনাথের হৃদয় আনন্দরসে পরিসিক্ত হইতে লাগিল, আর তিনি "হা গৌরাঙ্গ, হা নিতাই," এই সুধামাখা নাম জপিতে জপিতে,—এই সুধামাখা নাম গাইতে গাইতে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গৃহবাসের অবস্থা ও গৃহত্যাগের অবস্থা অতি সংক্ষেপে শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে, যথা:—

শ্রীমৎ দাসগোস্বামী।

শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমী ॥
অনুরাগ পরকাষ্ঠা শ্রীরাধাগোবিন্দে।
দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে ॥
শ্রীগোবিন্দ কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্য সম্পদ তাহে ঘৃণা হৈল ॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত ॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।
যাইয়া প্রসন্ন হইবার হৈল মনে ॥
নিকশিয়া যায় পুনঃ, পুন ধরি আনে।
পিতামাতা কাতর সবাই দুঃখ মনে ॥
নব লক্ষের রাজ্য সম্পদ সকলি তাহারে।
অপ্সরীর তুল্য যবতী নারী ঘরে।
তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে।
সে সকল তুচ্ছ বিষয়ে ভয় লাগে ॥
অনেক প্রহরী চৌকী রাখিয়া হারিল।
শেষে রজ্জুঁ দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল ॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
উচ্চৈস্বরে কান্দে সদা ভূমেতে পড়িয়া ॥
কেহ শিষ্টলোক বলে অনুচিত হয়।
নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারয় ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে বলিহারি ॥
পট্টরজ্জু দিয়া কি বান্ধিয়া রাখা যায়।
কেন বৃথা বাঁধ দেহ খুলি, হায় হায় ॥
ইহা শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজজন।
অনেক বুঝায় সবে করিয়া ক্রন্দন ॥

তেঁহ হেটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে জাগে, চেষ্টা নাই দেহে ॥
লোক চৌকি রাখি সবে সতর্ক রহিল।
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল ॥

রঘুনাথ এই প্রকারে কণ্টক কঙ্করময় পথে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে বারদিনে শ্রীপুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু হায় এদিকে রঘুনাথের পরিত্যক্ত সুখের সংসারে শ্মশানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নবম অধ্যায়।

মধুর মিলন।

বহুদিন পরে শ্রীমদ্ রঘুনাথের আশালতায় সাধনার শুভফল পরিপক্ক হইল। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ সেই সময়ে প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। রঘুনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নববধূর ন্যায় সসম্ভ্রমে ও সলজ্জ ভাবে দূরে দাঁড়াইলেন, অবশেষে ভক্তিবিগলিত ভাবে দূরে রহিয়াই ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত রঘুনাথকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন, সেই রঘু আসিয়াছে।" পরম দয়ালপ্রভু বরাভয়প্রদ হস্তে সঙ্কেত করিয়া রঘুকে নিকটে ডাকিলেন। রঘু তখন অগ্রসর হইয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন :—

হে নাথ হে প্রভো ওহে করুণানিধান।
কৃপা করি শ্রীচরণে দাও মোরে স্থান।
অনাথ অধম মুঞি অতি দীনহীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন ॥—ভক্তমাল।

প্রভু উঠিয়া ভূমি হইতে রঘুনাথকে তুলিয়া আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভুর সুপ্রসর শীতল বক্ষে রঘুনাথ মস্তক রাখিয়া এক প্রকার বিবশ হইয়া পড়িলেন। সংসার-বজ্রাহত রঘুনাথরূপ প্রেমলতিকা আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমকল্পতরুরূপ মহামহীরুহের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় পাইয়া জীবনের সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। প্রভুর কৃপাময় প্রেমালিঙ্গন পাইয়া রঘুনাথের চির তপ্ত হৃদয় আজ সুশীতল হইল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

স্বরূপাদি সহ গোসাঞী আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া॥
অঙ্গনে দূরে করে দণ্ড প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ॥
প্রভু কহে "আইল", তিঁহ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে কৈল আলিঙ্গন॥

কৃপাময় পাঠক, ভক্ত ও ভগবানের মিলন কি সুমধুর, এই স্থলে পাঠ বন্ধ রাখিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধদণ্ড কাল তাহাই একবার ভাবিয়া লউন। তকুল-সংপ্লাবনী-সিন্ধুবারিধারা যখন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাহার সেই অদম্য গতিকে বাঁধিয়া রাখা সম্ভবপর কি? শ্রীগৌরাঙ্গচরণে রঘুনাথের মিলন, অসংখ্য বাধা ও যাতনা-ভোগের অমৃতময় ফল। বাধায় ভক্তহৃদলের বল পরীক্ষিত হয়, বাধায় বাধায় ভক্তহৃদয় ভক্তিবলে আরও সুদৃঢ় হয়, বিঘ্ন-বাধা-বিপদেও যে ভক্তি অপ্রতিহতা ও অবিচলিতা থাকে, সেই ভক্তিই পরা ভক্তি। সংসারের কোন প্রতিবন্ধকতাতেই এই শ্রেণীর ভক্তমধুপগণকে ভগবচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দ-পানে অধিককাল বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। তাই প্রভু রঘুনাথকে এক সময়ে আশ্বাস দিয়া বলিয়া ছিলেন :—

সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে।

রঘুনাথের পিতৃদেব শ্রীল গোবর্দ্ধনও শ্রীগৌরাঙ্গকৃপার আকর্ষণী শক্তি-তত্ত্ব বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন :—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে॥

রঘুনাথের পরাভক্তি ও প্রভুর কৃপা এই উভয়ই এই মহামিলনের সাধক। বাহ্যভাবে এই মিলন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ভক্তের মিলন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু যখন মনে হয় শ্রীমদ্ রঘুনাথ সেই শ্রীরতিমঞ্জরী, তখন এই মিলন আরও মধুরভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন ব্রজবধূদিগের স্বজনসমূহের বাধার কথা মনে হয়, ব্রজের কণ্টক কঙ্করপূর্ণ কঠিন ভূমির কথা মনে হয়, ব্রজবধূদিগের কুসুমকোমল চরণের কথা মনে হয়, আর রসিকশেখর শ্যামসুন্দরের সেই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডা-কর্ষণী বংশীধ্বনির কথা মনে হয়, আরও মনে হয় রঘুনাথ যেন শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন করিয়া প্রেমময়ী গোপীর সুধাকণ্ঠে গাইতেছেন :—

আজুকে রজনী হাম, ভাগ্যে পোহাইনু,
পেখিনু পিয়মুখচন্দা।
জীবন যৌবন মন, সফল করি মানিনু
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥
সোহি কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চান্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখ লাখ হঁউ,
মলয় পবন বহু মন্দা।
আজুকে হামর দেহ, দেহ বলি মানিনু,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
আজু বিধি মোর, অনুকুল হোয়ল,
সফল ভেল সব আশা।

যাহা হউক, অতঃপর রঘুনাথ শ্রীপাদ স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণবন্দনা করিলেন, সকলেই রঘুনাথের সহিত সস্নেহে প্রেমালিঙ্গন। কনাপ্রবি রসের মধুর ধারায় যে সকল প্রেমিক ভক্তের হৃদয় ডুবিয়া রহিয়াছে, যাদের অন্তশ্চক্ষু সেই রসসুধাধারায় সরস ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারা নাথের এই মিলনে ব্রজমিলন-মাধুর্য্যের রসাস্বাদ অনুভব করিতে

পারিবেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বহিরঙ্গ অংশ লোকশিক্ষা-উদ্দেশ্য মূলক। শ্রীমদ্ রঘুনাথ তত্ত্বতঃ ব্রজমঞ্জরী হইলেও, এই লীলায় প্রভু তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে শুদ্ধভক্তগণের আদর্শরূপে ভক্তসমাজে প্রকটিত করেন। এই নিমিত্ত এই মধুর মিলনে ব্রজরসের লেশাভাসও অভিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের প্রাথমিক সাধককে যেরূপ আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতে হয়, প্রভু সেইরূপ ভাবে রঘুনাথের সাথে উপদেশ ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন,—রঘুনাথ, কৃষ্ণকৃপার ন্যায় প্রবলতম আকর্ষণ শক্তি জগতে আর কি আছে? এই দেখ, তুমি বিষয়-বিষ্ঠায় পড়িয়া কত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলে, দয়াময়ের কৃপায় তুমি সেই বিষ্ঠা বিষ হইতে ত্রাণ লাভ করিয়াছ।" ইহার উত্তরে রঘুনাথ পরম বিনয় সহকারে বলিলেন, "প্রভো, কৃষ্ণ কেমন তাহা আমি জানি না, তোমার কৃপাতেই যে আমি পরিত্রাণ পাইয়াছি, ইহাই আমি বুঝিতে পারিলাম।" যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:—

> প্রভু কহে কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
> তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
> রঘুনাথ কহে আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
> তব কৃপা কাড়িল আমায়, এই আমি মানি॥

তিনি আবার বলিলেন, "রঘুনাথ তোমার পিতা ও জেঠা আমার মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে অগ্রজের ন্যায় গণ্য করিতেন। তিনিও ইহাঁদিগকে সোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সেই সূত্রে ইহাঁরা আমার আজা। ইহাঁরা উভয়েই আমার মাতামহের ভ্রাতৃরূপ দাস। সেই সম্পর্কে পরিহাস করিয়া আমি ইহাঁদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা ভক্তগণের সমক্ষে বলিতেছি, তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারশীল, সৎক্রিয়াশীল, ব্রাহ্মণগণের পরম সহায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিছু বৈষ্ণবতাও আছে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? উহাঁরা পরম বিষয়ী। বিষয়-বিষেই উহাঁদের মহাসুখ। ইহাঁদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হৈয়া॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে ইহা কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ আজি হৈল ইহার নামে॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তারে দিল সমর্পিয়া॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী স্বীয় শ্রীচৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষেও এই সমর্পণের কথা অতীব নম্রতা ও দৈন্য সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—

কৃপাতে
যথা শ্রীচৈ

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ॥
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্দ্ধনশিলাং।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মুখবন্ধে বন্দনাস্বরূপ এই ভাবাত্মক একটী শ্লোক লিখিয়াছেন

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথ দাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুং প্রপদ্যে॥

মহাপ্রভু বলিতেছেন, "স্বরূপ, রঘুনাথ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সুতরাং রঘুনাথ আমার নিজের বস্তু। যাহাতে নিজের স্বত্ব নাই, তাহা অন্যকে দেওয়া যায় না, রঘুনাথ আমার নিজজন। আজ হইতে আমার এই রঘুনাথকে তোমাকে সঁপিয়া দিলাম। ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিও, ভৃত্যের ন্যায় ইহার সেবা গ্রহণ করিও। ইহাঁর নাম হইল

স্বরূপের রঘুনাথ” এই বলিয়া করুণাময় মহাপ্রভু রঘুনাথের হাত ধরিয়া উঁহাকে স্বরূপের হাতে সঁপিয়া দিলেন। এই দিন হইতে ভক্তসমাজে রঘুনাথ “স্বরূপের রঘু” বলিয়াই অভিহিত ও পরিচিত হইতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকর রচয়িতাও এই কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

স্বরূপের রঘুনাথে দর্শন না পাঞা।
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইয়া॥

ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহার আর একটী নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

“শ্রীমান্ দাস” নামে রঘুনাথ খ্যাত।
পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত॥

এই ‘শ্রীমান্ দাস” নামটী বাৎসল্যসূচক। নামটী শুনিলে মনে হয়, রঘুনাথ যেন শ্রীপাদ স্বরূপের ধর্ম্মপুত্ররূপে গৃহীত হইলেন। তরুণ রঘুনাথ আজ শ্রীপাদ স্বরূপের “শ্রীমান্ দাস”। কে বলে রঘুনাথ পিতৃস্নেহ হইতে দূরে অপসারিত? রঘুনাথ আজ যে পিতা প্রাপ্ত হইলেন, ইহজগতে এমন পিতা একবারেই অলভ্য। আমাদের পিতৃগণ অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন শিশু ও বালক সন্তানগণের প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষা ও সাংসারিক সুখের ব্যবস্থা করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ব্রজরস-সুধায় পুত্রপ্রতিম রঘুনাথের আত্মা সম্পুষ্ট করিয়া তুলিলেন এবং ব্রজভজনের গূঢ়রহস্য শিক্ষা দিয়, ব্রজসংসারের* ঘরকন্না ও সুখসম্পদ্ লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমন স্নেহময় পিতা এ জগতে আর কাহার আছে? ভক্তমণ্ডলী রঘুনাথের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া উঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিলেন।

* শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে রঘুনাথের হাত ধরিয়া দয়াময় মহাপ্রভুর এই রঘুনাথ সমর্পণ ব্যাপারের কথা উপক্রমণিকা অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এখানে সেই সকল কথার পুনরবতারণা করা গেল না। ফলতঃ এই দিন হইতেই রঘু ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। স্বরূপগুরু ভিন্ন রসের ভজনের সন্ধান-লাভ সুদুর্লভ।

অযাচক-বৃত্তি।

পরম দয়াল মহাপ্রভু রঘুনাথের দেহের দিকে চাহিয়া গোবিন্দদাসকে বলিলেন, "গোবিন্দ, অনাহারে ও পথশ্রমে রঘুনাথ বড়ই ক্লেশ পাইয়াছে। কয়েক দিন পর্যান্ত ইহার সন্তর্পণের জন্য তোমাকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে যথাসময়ে রঘুনাথ প্রসাদাদি পায়, তুমি সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখিও।" রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এই কৃপা দেখিয়া ভক্তমাত্রেই রঘুনাথের ভাগ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের আদেশে সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিয়া রঘুনাথ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন, প্রসাদ পাইলেন। এইরূপ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত রঘুনাথ শ্রীল গোবিন্দ দাসের দ্বারা সমানীত প্রসাদ পাইলেন।

রঘুনাথ, নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের আদর্শ,—রঘুনাথ বৈরাগ্যের অবতার। যিনি বিপুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—সহজে প্রাপ্ত, অপরের আনীত প্রসাদ, অলসের মত আহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? শ্রীল গোবিন্দদাসের আনীত প্রসাদ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিয়া রঘুনাথ মনে করিলেন, বৈরাগীর পক্ষে এ বিলাস শোভা পায় না। তাঁহার উদরের তৃপ্তির জন্য পরম ভক্তের শ্রম ও সময়ের অপব্যয় হইবে কেন? রঘুনাথ ষষ্ঠ দিবস বিনয় সহকারে শ্রীল গোবিন্দদাসকে প্রসাদ আনিতে বারণ করিলেন। তিনি অতি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের নিয়মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিষ্কিঞ্চনগণ উদরের তৃপ্তি জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেন না। শ্রীক্ষেত্রবাসী এই শ্রেণীর ভক্তেরা, সারাদিন ভজনানন্দে ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদিতে নিরত থাকিয়া রাত্রি দশ দণ্ডের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলী দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সেবকগণ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে সিংহদ্বারে কোন নিষ্কিঞ্চন অযাচকভাবে প্রসাদের নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছেন কিনা, তাহা দেখিয়া পরে পসারীর নিকট অবশিষ্ট প্রসাদান্ন রাখিয়া যাইতেন। কোন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত প্রসাদে বঞ্চিত না হয়, এ বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। রঘুনাথ এই দিবস হইতে সারাদিন ভজনানন্দে নি-

থাকিতেন, সন্ধ্যার পরে পুষ্পাঞ্জলী দর্শন করিতেন, রাত্রি দশ দণ্ডের পরে সিংহদ্বারে অযাচক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ দয়াপরবশ হইয়া যে প্রসাদ প্রদান করিতেন, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন। রঘুনাথ এই বৈরাগ্য-প্রধান নিষ্কিঞ্চনগণের আদর্শস্থানীয় হইলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

আর দিন হৈতে পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীরগণ।
সেবা সারি রাত্রি করে গৃহেতে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারীর ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া
এই মত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে।
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥
কেহ ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণ নিরন্তর ভজনানন্দপরায়ণ। ভজনানন্দই যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, উদরপরায়ণতা তাঁহাদের নিকট আদৌ আসিতে পায় না। এই জন্য পশ্চিম দেশীয় মহাজনগণের বাক্য এই যে

সাধু ভজে ভজনকো ভোজন ভজে না।
যে সাধু ভোজন ভজে সো সাধু সাধু না।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্যের পরমাদর্শ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য-প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথ সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভজন-সাধনে

প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দদাসের মুখে এই সংবাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এই উপলক্ষে বৈরাগ্যাবলম্বীদিগের সৎশিক্ষার জন্য প্রভু যে সুধাময় উপদেশ বাক্য প্রকাশ করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত বৈরাগিমাত্রেরই একান্ত প্রতিপাল্য। অধুনা ভিক্ষুক বৈরাগিগণ মহাপ্রভুর নাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। ইহাঁদের বেশ বিন্যাস দেখিলে প্রকৃতই প্রভুর ধর্ম্মের কথা মনে পড়ে। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় বৈরাগ্য ধর্ম্মের কঠোরতা রক্ষা করিয়া চলিতে না পারায় বা চিত্তের তাদৃশী প্রবৃত্তি না থাকায় সনাতন ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার অসদনুষ্ঠান ও নারকীয় কার্য্য প্রশ্রয় পাইতেছে, ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। ধর্ম্মের এই প্রবল গ্লানির সময়ে বৈরাগিমাত্রেরই প্রভুর শ্রীমুখের অমৃতময় উপদেশ বাক্য স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। সেই উপদেশ বাক্য এই ঃ—

"বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় হয় আর রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফলে মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

বৈষ্ণব বৈরাগিগণ প্রোজ্জ্বল বৃহৎ অক্ষরে এই উপদেশ সতত নয়ন সমক্ষে রাখিয়া ধ্যানমজ্জিত তাপসের ন্যায় এই সাধনায় বিভোর হইতে চেষ্টা করুন। তাঁহাদের সাধনার বলে সমগ্র জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীমদ্ রঘুনাথের জীবন কঠোর বৈরাগ্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ।

উপদেশ ও শিক্ষা।

শ্রীমদ রঘুনাথ এইরূপে প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে নীলাচলে বাস করিয়া অযাচকবৃত্তিতে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ভজনের পিপাসা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। রঘুনাথ যদিও ভজনানন্দেই দিনযামিনী যাপন করিতেন তথাপি তাঁহার মনে হইত তাঁহার জীবনের ইতিকর্ত্তব্যতা বুঝি এখনও নির্দ্দিষ্ট হইল না, তাঁহাকে কি করিতে হইবে, কোন্ পথে কি প্রকারে চলিতে হইবে, এখনও যেন সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ বাকী আছে। রঘুর মনের বাসনা,—একবার মহাপ্রভুর কৃপা উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দীনচিত্ত অতি বিনীত রঘু মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সমক্ষে কথা বলাও বেয়াদবী বলিয়া মনে করেন। প্রভুর নিকট কোন কথা বলিতে হইলে তিনি হয়তো শ্রীল গোবিন্দদাস—নয়তো তদীয় গুরু শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর দ্বারা প্রভুর চরণে নিজের মনের কথা জানাইতেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ—

প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজবাত॥

একদিন রঘুনাথ স্বীয় গুরু শ্রীপাদ স্বরূপের শ্রীচরণে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু কেন আমাকে দয়া করিয়া এখানে আনিলেন, আমার কর্ত্তব্যই বা কি, এই উপদেশ দিলে এ দীনের উপর যারপর নাই কৃপা করা হয়।" দয়াময় শ্রীপাদ স্বরূপ. মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া বলিলেন "প্রভো, আপনার রঘুনাথের একটা নিবেদন—রঘুনাথের স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে আপনার শ্রীমুখের উপদেশ ভিক্ষা চাহিতেছে।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ—

প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু করুন উপদেশ॥

মহাপ্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন "স্বরূপকে যখন তোমার উপরে

করিয়াছি, তখন তোমার আর চিন্তা কি? সাধ্যসাধন-তত্ত্ব ইঁহার নিকটে শিখিবে। বলিতে কি সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শ্রীল স্বরূপ যত জানেন, আমিও তত জানি না। তবে আমার আজ্ঞায় তোমার যদি একান্তই শ্রদ্ধা হয়, তবে এই নিয়মগুলি প্রতিপালন করিও" এই বলিয়া প্রভু বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥

এই মত সংক্ষেপে আমি কৈনু উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥*

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া একটু হাসিয়া এই উত্তর দিলেন। এই প্রশ্নে তাঁহার হাস্যোদ্গমের কারণ কি? গম্ভীরাশয় মহাপ্রভুর ভাবের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা জীবের সাধ্যাতীত। হইতে পারে রঘুনাথের দৈন্যোক্তিই তাঁহার হাস্যের কারণ। যিনি ভজনের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিলেন তিনি বলিলেন কিনা, "আমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, আমি তাহা জানি না, প্রভু কি আমায় কৃপা করিয়া সেই উপদেশ প্রদান করিবেন?" হয়তো ইহা মনে করিয়াই প্রভু হাসিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভবনীয় যে রঘুনাথ অস্পষ্ট ভাবে রসের ভজনের অধিকার-লাভের জন্যই মহাপ্রভুর কৃপানুমতি ভিক্ষা করার নিমিত্ত এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করেন।

অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই ঈষদ্‌হাস্য করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। অন্তরঙ্গ ভজনের প্রথম উদ্যমেই গ্রাম্যব্যবহার, গ্রাম্য বার্ত্তাকথন ও শ্রবণ প্রভৃতি পরিত্যাগ ও আহারে ব্যবহারে সর্ব্বথা বৈরাগ্যাবলম্বন অতি প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য রঘুনাথ এই উপদেশবাণীর

প্রভু অতি সংক্ষেপে শ্রীমদ্ রঘুনাথকে ভজনতত্ত্বের উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমি তোমাকে অতি সংক্ষেপে এই উপদেশ প্রদান করিলাম। ইহার সবিশেষ তত্ত্ব স্বরূপের নিকট জানিয়া লইবে। প্রভু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন ঃ—

সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইহোঁ যত জানে॥

সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষাদান সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের বিশিষ্ট

উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই উপদেশ তাঁহার জন্য নহে। কেননা, গ্রাম্যবার্ত্তা ও গ্রাম্য ব্যবহারে বিরতি রঘুনাথের আজন্ম অভ্যাস। সাধনার পথে প্রবর্ত্তক সংসারত্যাগী নব বৈষ্ণবের জন্যই এই উপদেশ।

গ্রাম্যবার্ত্তা শব্দের অর্থ, -বিষয়বার্ত্তা। বিষয়বার্ত্তা শ্রবণে এক গ্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত মলিন হইয়া পড়ে, ভগবদ্ধারণার অনুপযুক্ত হয় এবং অতি সত্বরেই চিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রে "গ্রাম্য" শব্দের আরও একটী অর্থ আছে, যথা ঃ—

অশ্লীলামঙ্গলঘৃণাবদর্থং গ্রাম্য মুচ্যতে।

সরস্বতী কণ্ঠাভরণ।

অর্থাৎ অশ্লীল অমঙ্গল ও ঘৃণাবদর্থ প্রকাশক শব্দই গ্রাম্য শব্দ বলিয়াই অভিহিত। অশ্লীল আবার ত্রিবিধ, যথা ঃ—

অত্রাশ্লীলমসভ্যার্থ মসভ্যার্থস্তরঞ্চ যৎ।
অসভ্যস্মৃতি হেতুশ্চ ত্রিবিধং পরিপঠ্যতে॥

সরস্বতী কণ্ঠাভরণ।

অর্থাৎ অসভ্যার্থ, অসভ্যার্থ গত এবং অসভ্য স্মৃতির উদ্রেক হয় যে শব্দে, তাহাই অশ্লীল। এই অশ্লীলই গ্রাম্য। সাধুরা বৈষয়িক কথা অমঙ্গলজনক ও "বাজে কথা" বলিয়া ঘৃণা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

গ্রাম্য গীতং ন শৃণুয়াদ্ যতি র্বনচর ক্বচিৎ
শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়ো র্গীতমোহিতাৎ॥

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। শ্রীবল্লভ আচার্য্যের নিকট মহাপ্রভু বলেন,—"আমি শ্রীস্বরূপদামোদরের নিকট ব্রজের মধুর রসতত্ত্বের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। স্বরূপদামোদর মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস, আমি স্বরূপের নিকট ব্রজের অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি।" ফলতঃ প্রিয়-ভক্তের মানবর্দ্ধন করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্তমানদ আর কে আছেন? অপরন্তু শ্রীমদ্ রঘুনাথকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার তাঁহার

নৃত্যবাদিত্র গীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি বোধিতান্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যোশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ॥

৮ম অধ্যায় ১১শ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

এই স্থলে অশ্লীল গীতই বুঝিতে হইবে। আসল কথা এই যে ভগবৎ কথা ভিন্ন অপর কথা নিষ্কিঞ্চন (বিষয়যাভিমানিবস্ত, ভক্তগণের অগ্রাহ্য।

প্রভুর অপর উপদেশ এই যে ভাল খাইবে না, ভাল পরিচ্ছেদ পরিবে না। তিনি অতি সংক্ষেপে এই কথা দ্বারা সংসারত্যাগী বৈষ্ণবগণের ইন্দ্রিয় বিলাসভোগের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাই বেদ। শাস্ত্রকারগণ জীবের হিতের জন্য শাস্ত্রে উহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। মনু বলেন :—

একবারং চরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তোহি যতি বিষয়েষ্বপি সিজ্জতে॥

অর্থাৎ বৈরাগ্যশীল যতি একবার মাত্র আহার করিবে, তাহাও বেশী না হয়, এবং তাহাতে সবিশেষ উপকরণ না থাকে। টীকাকার কল্লুক ভট্ট বলেন, যৎকিঞ্চিৎ আহারে প্রাণধারণ মাত্র করিতে হইবে। নানাবিধ উপকরণে প্রচুর পরিমাণে আহার করা নিষিদ্ধ। কল্লুক এই কথা বলিয়া তাহার কারণ বলিতেছেন :—প্রচুর আহার প্রসক্ত হইলে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্ত, স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে প্রসক্ত হইয়া পড়ে। মনু আরও বলেন :—

অল্পান্নাভ্যবহারেণ রহঃ স্থানাসনেনচ।
হ্রিয়মানানি বিষয়ৈ রিন্দ্রিয়ানি নিবর্ত্তয়েৎ॥

কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, তিনি তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু পাছে রঘুনাথ মনে ব্যথা পায়, এই জন্য কিছু না বলিলে নয় বলিয়া দুটী উপদেশ দিয়া রঘুনাথকে পুনরায় স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভজন পথপ্রদর্শক শ্রীপাদ স্বরূপের চরণ-পার্শ্বে রঘুনাথ অন্তরঙ্গ ভজনে নিমগ্ন

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষ ক্ষয়েনচ।
অহিংসায়া চ ভূতানামমৃতত্বায়কল্পতে॥

৫৯।৬০ শ্লোক, ষষ্ঠ অধ্যায়। মনু।

আহার, লাঘব ও নির্জ্জন স্থানাদিতে বাস দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ হয়। ইন্দ্রিয়-নিরোধ ও রাগ-দ্বেষ-হিংসা বর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা বিষয় হইতে বিরক্তি সাধিত হয়। ইহার পরের শ্লোকের টীকায় মহামতি মেধাতিথি লিখিয়াছেন,— জীবের কর্ম্মদোষে ও প্রতিবিদ্ধসেবনে, হিংসা স্তেয় পার-দার্য্য পারুষ্য পৈশুন্য ও অনিষ্টসঙ্কল্পাদির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং এই সমুদয় হইতে আধিব্যাধি দারিদ্র্য পরাভব শোক ভয় ও নরক ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন ঃ—

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধি মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জ্জয়িত্বাতু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে॥
তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো নস্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবৎ জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥

৮ম অধ্যায়, ১১ স্কন্ধ শ্রীভাগবত।

রসনা জয় না করিলে ইন্দ্রিয়-জয় করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণ ভজন অসম্ভব। সুতরাং ইন্দ্রিয় জয়ের নিমিত্ত রসনা জয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইহাই শাস্ত্রের বিমল অভিপ্রায়। বিজ্ঞানের যুক্তি, পরিচারিকার ন্যায় এই শাস্ত্রীয় উক্তির পরমা সেবিকা এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী। তাই প্রভু বিশ্ব বৈষ্ণবজনের শিক্ষার্থ অতি সংক্ষেপে

হইলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥

অন্তরঙ্গ সেবায়* যে বিমল প্রেমানন্দ রসের সঞ্চার হয়, রঘুনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আনন্দ-চিন্ময়-রসে সম্পুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

* উপক্রমাণকায় "অন্তরঙ্গ সেবা"র কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এই কৃপা-উপদেশ দান করিলেন ঃ—

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"

প্রভুর উপদেশের মধ্যে আর একটী কথা "তৃণাদপি শ্লোক"। কি প্রকারে কৃষ্ণনাম করিলে প্রেমোদ্ভব হয়, এই শ্লোকই তাহার সাধনমন্ত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে. তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়কে বলিতেছেন ঃ—

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয় ॥
সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
গ্রীষ্ম বর্ষা সহে আনেরে করয়ে পোষণ ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

এই প্রেম সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই রসের ভজনারম্ভ হয়। প্রভু কৃপা করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ রঘুনাথকে অতি সঙ্ক্ষেপে এই ভজনের সঙ্কেত উপদেশ দিলেন যথাঃ—

"[illegible] মানসে করিবে।"

আমরা ইতঃপূর্ব্বে [illegible] তার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচনা

দশম অধ্যায়।

—∞—

পিতৃস্নেহ ও পুত্রের বৈরাগ্য।

রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল, গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে পৌছি-লেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য শিবানন্দ সেন প্রভৃতি আসিয়া দেখিতে পাই-লেন, রঘুনাথ বহুপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল শিবানন্দ বলিলেন, "রঘুনাথ তুমি বাড়ী হইতে পলা-ইয়া আসিলে পর, ওদিকে তোমার পিতা তোমাকে ফিরাইয়া বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য আমার নিকট এক পত্র লেখেন; দশজন লোক ঐ পত্র সহ ঝাকড়া পর্য্যন্ত আসিয়া আমার সাক্ষাৎ পায়, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া উহারা ফিরিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া শিবানন্দ রঘু-নাথকে গৌরকৃপালাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে রঘুনাথ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া গৌরভক্তি-লাভের জন্য আশী-র্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। আচার্য্য প্রভুও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রকাশ করিলেন। রঘুনাথ ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন বন্যভোজন ও রথাগ্রে নর্ত্তন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও নিরতিশয় বিমুগ্ধ হইলেন। ভক্ত-গণ চারিমাস কাল মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-পার্শ্বে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছি। এস্থলেও সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। ভজন সম্বন্ধে একটী উপদেশ এই যে:—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শরীর দ্বারা যদি ব্রজে বাস না হয় তবে মন দ্বারা ব্রজে বাস করা কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়া-ছেন "শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীতি" অর্থাৎ

শরীর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা না ঘটিলে "আমি ব্রজে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের করিলেন। দেখিতে দেখিতে বৎসর প্রায় কাটিয়া গেল। আবার গৌড়ীয় ভক্তগণের রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাওয়ার সময় হইল।

এই সময়ে শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত শ্রীল শিবানন্দের নিকট লোক পাঠাইলেন। গোবর্দ্ধনের প্রেরিত লোক যথা সময়ে শিবানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শ্রীল গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস নামে কোন একজন যুবক বৈষ্ণবকে কি মহাপ্রভুর নিকট দেখিতে পাইয়াছেন? তাঁহার সহিত কি আপনার আলাপ পরিচয় হইয়াছে? আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাইব।"

শিবানন্দ বলিলেন, "হাঁ, তিনি মহাপ্রভুর নিকটেই আছেন। তাঁহাকে কে না চিনে? তিনি যদিও অল্পদিন হইল নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজনের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত

ভজন করিতেছি," মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মানসী সেবার আরও কথা আছে।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

সুতরাং ব্রজজনের ভাবে ভাবিত হইয়া রসিকশেখর কৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে। তজ্জন্য মানস সেবার প্রক্রিয়া এই যে—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞা সেবাপরং তত্তৎরূপালঙ্কারভূষিতাম্॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।

অপিচ—

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥

সনৎকুমার সংহিতা।

ইহাই মানসী—

হইয়াছেন। (১) মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রভুর ভক্তগণের প্রাণতুল্য। রাত্রিদিন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকেন, ক্ষণমাত্রও প্রভুর চরণ ছাড়া হন না। তিনি অতি কঠোর বৈরাগ্যাবলম্বী, পরিধান ও ভক্ষ্যের দিকে তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া দশদণ্ড রাত্রির পরে সিংহদ্বারে প্রসাদের জন্য

---

(১) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ লিখিত আছে :—

শিবানন্দ। (তত্রৈক প্রতি) অয়ে ত্বং কুতোঽসি।

সঃ। মহাত্মন্, গোবর্দ্ধন দাসেন তৎসমীপং প্রেরিতঃ।

শিবানন্দ। আঃ জ্ঞাতম্! রঘুনাথদাসোদ্দেশার্থং গমিষ্যতি ভবান্।

সঃ। অথং কি।

শিবানন্দ। কিং তদুদ্দেশেন?

অন্যঃ। মহাশয় স ত্বয়া পবিচীয়তে?

শিবানন্দ। শ্রূয়তাম্

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়।
তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্॥
শ্রীচৈতন্য কৃপাতিরেক সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো।
বৈরাগ্যস্য নিধি র্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

আপচ— যঃ সর্ব্বলোকেক মনোঽভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায় মারোপণ তুল্যকালং
তৎপ্রেম শাখী ফলবানতুল্যম্॥

তথাপি আগচ্ছ, ময়ৈব প্রতিপাল্য মেতব্যোঽসি যাবদদ্বৈতাচার্য্য দেবজ্ঞা ন লভ্যতে তাবদেব বিলম্ব ইতি চিন্তয়তি।

শ্রীল প্রেমদাস. পদ্যে ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, যথা :—

সমাগত লোক বলে "শুন মহাশয়,
রঘুনাথ দাস সনে আছে পরিচয়?"

দণ্ডায়মান হয়েন, দয়া করিয়া কেহ কিছু দিলে ভক্ষণ করেন, নতুবা উপবাসী রহিয়াই নাম জপে বিভোর থাকেন।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভু স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম॥

সেই বলে পরিচয় কি জিজ্ঞাস্য আর?
প্রাণাধিক প্রিয় রঘুনাথ মো সবার॥
তাহার বৈরাগ্য রীতি সৌশীল্য ভজন।
দেখি তারে প্রীতি করে সর্ব্বভক্তগণ॥
শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞী বাসুদেব ছাত্র।
যদুনন্দন আচার্য্য তাঁহার কৃপাপাত্র॥
তার শিষ্য রঘুনাথ প্রাণাধিক মোর।
শ্রীচৈতন্য কৃপামৃতে সিক্ত স্নিগ্ধতর॥
বৈরাগ্যের নিধি দেখি গৌর ভগবান্।
অনুগত করি দিল স্বরূপের স্থান॥ ইত্যাদি

দ্বিতীয় শ্লোকটার মর্ম্মার্থ এই যে রঘুনাথ সকলেরই অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি সৌভাগ্যভূমিস্বরূপ, কেননা কর্ষণ ব্যতিরেকেও তাঁহাতে ফলোৎপত্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য-প্রেমবীজ তাঁহার হৃদয়ে পতিত হওয়া মাত্রই উহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া অতুল্য সুফল প্রসব করিয়াছে।" এই বলিয়া শ্রীল শিবানন্দ সেন মহাশয় বলিলেন, "তুমি কি রঘুনাথকে দেখিতে যাইতে চাও? তাহা হইলে আমিই তোমাকে যত্নপূর্ব্বক লইয়া যাইব। কেবল শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য দেবের আদেশ প্রতীক্ষায় আমাদের বিলম্ব হইতেছে।"

শ্রীল শিবানন্দ গৌড়ীয় ভক্তগণকে প্রতি বৎসর অতি যত্নপূর্ব্বক নীলাচলে লইয়া যাইতেন। তিনি পথের অভিভাবক হইয়া চণ্ডালাদি জাতির প্রতিও সমভাবে যত্ন প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

রাত্রিদিনে করে তিঁহ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ।
দশ দণ্ড রাত্রি গেলে অঞ্জলী দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥

শ্রীল শিবানন্দ প্রমুখাৎ রঘুনাথের এই প্রকার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন দাসের প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলেন। গোবর্দ্ধন ইহাতে অতীব বিস্মিত হইলেন। লোকে বলে "রাজপুত্র পথের ভিখারী।" কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র রঘুনাথ আজ পথের ভিখারী হইতেও হীনাবস্থাপন্ন। তাঁহারা গৃহে রাজভোগে সুখে স্বচ্ছন্দে উদর পূরণ করিতেছেন, আর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কোন দিন এক মুষ্টি অন্ন পাইতেছেন, কোন দিন বা উপবাসেই কাটাইতেছেন, পিতামাতার প্রাণে ইহা সহ্য হয় কি? গোবর্দ্ধন তাঁহার পুত্রের আহারের ক্লেশ নিবারণের জন্য চারিশত টাকা সঙ্গে দিয়া দুইজন ভৃত্য এবং একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল শিবানন্দের সহিত নীলাচলে পাঠাইলেন। যথাসময়ে ইঁহারা সকলে নীলাচলে পঁহুছিলেন। ভৃত্য দুইজন ও ব্রাহ্মণটী রঘুনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি এখানে অনাহারে ও অযত্নে কষ্ট পাইতেছেন, সেই জন্য আপনার পিতা চারিশত টাকা আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন। আপনার আহারের ও যত্নের জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা আপনার নিকট থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিব।" রঘুনাথ বলিলেন, "পিতার চরণে আমার শতকোটী প্রণাম; তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া তৎপ্রদত্ত অর্থের সম্মাননার জন্য ইহা হইতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত কিছু লইব। অবশিষ্ট মুদ্রায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই, আমি ভিখারী হইয়াছি। আমার আহার ও যত্নের জন্য তোমরা কোনরূপ চেষ্টা করিলে তাহাতে আমার ধর্ম্মহানি হইবে।

তোমরা এথা হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে যাইয়া পিতার চরণে ইহা নিবেদন করিবে।" রঘুনাথ অর্থ অঙ্গীকার করিলেন না দেখিয়া, একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য অর্থ লইয়া নীলাচলেই বাস করিতে লাগিল। রঘুনাথ প্রতিমাসে দুইবার করিয়া মহাপ্রভুর ভোগ দিতেন। প্রত্যেক-বার সেবার জন্য তিনি আট পণ কৌড়ি উহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্ট পণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ॥

রঘুনাথ দুই বর্ষ পর্য্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া এইরূপে প্রভুর ভোগ দিতেন। অবশেষে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। এক মাস চলিয়া গেল, আরও এক মাস চলিয়া গেল। মহাপ্রভু একদিন শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন, "স্বরূপ রঘু আর আমারে নিমন্ত্রণ করে না কেন?"

স্বরূপ বলিলেন, "প্রভো, রঘুনাথ আপন মনে বিচার করিয়া দেখিল বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া নিমন্ত্রণ করায় প্রভুর মন বুঝি প্রসন্ন হয় না, এমন কি, তাহার নিজের মনই ইহাতে প্রশুদ্ধ হইতেছে না, অপরন্তু প্রভু যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, ইহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অপর কোন ফল হয় না। প্রতিষ্ঠা ভক্তির বাধা-স্বরূপ। রঘু আরও বলে যে "আমি-মূর্খ পাছে বা অসন্তুষ্ট হই, প্রভু হয় ত মূর্খের মন রক্ষার জন্য অন্যায় উপ-রোধের বশীভূত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। সুতরাং এই অসঙ্গত কার্য্য ত্যাগ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিচার করিয়াই রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিয়াছে।"

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহার জানি প্রভুর মন॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল॥

উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূর্খ জন॥

শ্রীপাদ স্বরূপের মুখে মহাপ্রভু রঘুনাথের এই সূক্ষ্ম বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "রঘু ঠিক বুঝিয়াছে। বিষয়ীর অন্ন খাইলে মন মলিন হয়, মলিন মনে কৃষ্ণস্মৃতি হয় না। (২) বিষয়ীর অন্ন রাজস অন্ন। উহাতে দাতা ও ভোক্তা উভয়ের মনই মলিন

(২) বিষয়ীর নিকট হইতে প্রতিগ্রহের বিবিধ দোষ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মনু বলেন :—

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেন হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি॥
১৮৬ শ্লোক, চর্থ অধ্যায়, মনু।

দাতা ও ভোক্তা উভয়ের মনই যে মলিন হয়—উভয়েরই যে অধোগতি হয়, শাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ আছে, যথা :—

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥
১৯০ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায়।

যথা প্লবেনোপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জিতোঽধো স্তদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ॥
১৯৪ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায় মনু।

সেই জন্য যার-তার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ নিষেধ আজ্ঞা রহিয়াছে, যথা :—

তস্মাদ্‌বিদ্বান্ বিভিয়াদ যস্মাৎ তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
১৯১ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায়, মনু।

অন্ন সম্বন্ধেও এইরূপ বহুল নিষেধ দৃষ্ট হয়। যথা—

দ্বিষদন্নং নগর্য্যন্নং পতিতান্নমবক্ষুতম্।
পিশুনানৃতিনোশ্চান্নং ক্রতু বিক্রয়িণ স্তথা॥

হয়। কেবল রঘুনাথের উপরোধেই আমি এতদিন তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। সে যে নিজে বুঝিয়া নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা অতি উত্তম। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

শৈলূষতুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেবচ।
কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য॥
সুবর্ণ কর্ত্তুর্বৈণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণ স্তথা।
শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ॥
রঞ্জকস্য নৃশংসস্য যস্য চোপপতিগৃহে।
মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
অনিদশঞ্চ প্রেতান্ন মতুষ্টিকর মেবচ॥
রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্ম বর্চ্চসম্॥
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিণঃ।
কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্যচ।
গণান্নং গনিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি॥
পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যা স্ত্বন্ন মিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকাস্যান্নং শস্ত্র বিক্রয়িণোমলম্॥

চতুর্থ অধ্যায়—মনু।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে স্পষ্ট কথা এই যে "যো যস্য অন্নমশ্নাতি স তস্য পাপ-ভুক্ ভবেৎ" অর্থাৎ যে যাহার অন্ন প্রতিগ্রহ করে, সে তাহার পাপভুক্ হয়। অন্নই আমাদের প্রাণের শক্তি। অন্ন আশ্রয় করিয়া পাপ বর্ত্তমান থাকে। যথা "অন্নমাশ্রিত্য পাপানি তিষ্ঠন্তি হরিবাসরে।" অন্নের সহিত পাপের সঞ্চার কি নিয়মে ঘটে, তাহা স্থূল বিজ্ঞানের অতীত হইলেও ঋষিবাক্যে, এমন কি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বাক্যে এই সত্য প্রকটিত হই-য়াছে। সুতরাং বৈরাগ্যশীল যতিদের ইহাতে অবজ্ঞা করিলে শ্রীভগবানের আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধ ঘটে।

বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥

রঘুনাথ কিয়দ্দিন পরে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টাটীও ছাড়িয়া দিলেন। ছত্রে যাইয়া ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মহাপ্রভু সততই রঘুনাথের তত্ত্ব লইতেন। রঘু কোথায় কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে, স্নেহময় মহাপ্রভু মায়ের মত সে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান রাখিতেন। তিনি গোবিন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রঘু আর এখন সিংহদ্বারে ভিক্ষার নিমিত্ত অপেক্ষা করেন না। তিনি ছত্রে আসিয়া যাহা পান, তাহাতেই কোন প্রকারে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, আর সর্ব্বদা ভজনানন্দে মগ্ন থাকেন। শ্রীপাদ স্বরূপকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বরূপ, রঘু সিংহদ্বারে প্রসাদের জন্য এখন দাঁড়ায় না কেন?" স্বরূপ বলিলেন, "সিংহদ্বারে অন্নের জন্য দাঁড়াইয়া লোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা রঘুনাথ ভাল বলিয়া বোধ করে না। এখন মধ্যাহ্ন সময়ে ছত্রে যাইয়া মাগিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পায়, তাহাতেই জীবনধারণ করিতেছে।"

বলা বাহুল্য ছত্রের অন্ন অতি কদর্য্য ও উপকরণবিহীন। মহাপ্রসাদ রাজপ্রদত্ত ভোগ। রঘু সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া আর সেই রাজভোগের উপকরণশীল মহাপ্রসাদের প্রতীক্ষা না করিয়া ছত্রের সামান্য কিঞ্চিৎ অন্ন ভিক্ষা করিতেন। মহাপ্রভু শুনিয়া বলিলেন' "রঘু অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছে। কেননা সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার"। প্রভু শ্লেষ করিয়া বলিলেন :--

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি
অনেন দত্ত মযমপরঃ।
সমেষ্যত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি
ন দত্ত মন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

অর্থাৎ এই একজন আসিতেছেন, ইনি কিছু দিবেন, ইনি দিয়াছেন। ইনি দিলেন না, আবার আর একজন আসিয়া দিবেন এইরূপ প্রতীক্ষা করা,— রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যাগণের কামলম্পট পুরুষদের

জন্য প্রতীক্ষা করার তুল্য। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবদের পক্ষে একমুষ্টি অন্নের জন্য এইরূপ প্রতীক্ষা করা নিতান্তই ক্লেশকর ও অশোভনীয়। (৩)

রঘুনাথের এইরূপ বৈরাগ্যে মহাপ্রভু পরম পরিতুষ্ট হইলেন, যথা- শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি মুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥

নিশ্চিন্ত না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। দেহ-ধর্ম্মে আহারের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবি। কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নকাল পর্য্যন্ত জীবগণ ঐ চিন্তাতে বিভোর থাকে। সাধকদের পক্ষে উদরভরণ চিন্তা এক প্রবল বাধা। রঘুনাথ সহসা এই বিঘ্নের বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কৃষ্ণধ্যান ও কৃষ্ণগুণগানে দিন রজনী পরম সুখে যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যান ব্যতীত অন্য ভাব স্থান পাইত না এবং মুখে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণগান ভিন্ন আর অন্য কথা উচ্চারিত হইত না।

---

(৩) ভিক্ষুকদিগের পক্ষে অন্নের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্‌গ্রাসং দেহো বর্ত্ততে যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরা মত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥

একাদশস্কন্ধ শ্রীভাগবতে।

একাদশ অধ্যায়।

—:o:—

শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা।

মহাপ্রভু রঘুনাথের এতাদৃশ কঠোর বৈরাগ্যাচরণ ও বিশুদ্ধ ভক্তিভাব সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ রঘুনাথকে যে অমূল্যধন প্রদান করেন, ভক্তি-রাজ্যে তাঁহার ন্যায় ধন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই মহা মহাধনের নাম--শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন হইতে এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু আনিয়া মহাপ্রভুকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রভু এই অপূর্ব্ব ধন কখন মাথায়, কখন নাসায় কখন চক্ষে ও কখনও বা বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইতেন। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাকে প্রভু চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ কলেবর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার প্রেমাশ্রুতে অনেক সময়ে এই শ্রীশিলা পরিসিক্ত হইতেন। মহাপ্রভু এই শ্রীশিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমদ্ রঘুনাথকে অর্পণ করেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

এত বলি তারে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহো সেই শিলা, গুঞ্জমালা লঞা গেলা॥
পার্শ্বে গাথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধন শিলা কভু হৃদয় নেত্রে ধরে।
কভু নাসার ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন কভু কৃষ্ণ কলেবর॥

এই মত শিলা মালা তিন বৎসর ধরিলা।
তুষ্ট হৈঞা শিলামালা রঘুনাথে দিলা ॥

যেমন ভক্ত, তেমন প্রভু, তেমনই তাঁহার কৃপার পরিচায়ক অপূর্ব্ব পুরস্কার! এই শিলা ও মালায় প্রেমময় মহপ্রভু যে প্রেমভক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন ভাগ্যবান্ রঘুনাথ সেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার অতি যত্নের ধন,—শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জা মালা রঘুনাথকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই শিলা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ, তুমি আগ্রহ করিয়া ইহার সেবা করিবে। ইহাঁর সেবার জন্য তোমার কোন প্রকার কষ্টকর প্রয়াস পাইতে হইবে না। ইহার সাত্ত্বিক সেবন করিলে অচিরেই তোমার কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হইবে। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥

সাত্ত্বিকপূজা কাহাকে বলে? শাস্ত্রে সাত্ত্বিক পূজার যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে উপাদি দ্বারাই পূজার কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ রঘুনাথকে প্রভু যে সাত্ত্বিক পূজার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন তাহা এই :-

এককুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ (১)

---

(১) গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে :—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে সমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

এই বচনটী শ্রীহরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসেও ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে একদল তুলসী এবং একগণ্ডুষ জল পাইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

শ্রীপাদ স্বরূপ একটী কুঁজা, পূজার পিঁড়া এবং শ্রীমূর্ত্তির আসনাস্তরণ ও রাত্রিতে আবরণের জন্ম এক এক বিতস্তি পরিমিত দুইখানি বস্ত্র আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ কপর্দ্দকবিহীন অকিঞ্চন। সুতরাং শ্রীপাদ স্বরূপকেই কৃপা করিয়া এই পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে হইল, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

এক এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পাণি॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বহস্ত প্রদত্ত শ্রীশিলা পাইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ অতীব আগ্রহ সহকারে পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূজার সময় রঘুনাথের দিব্য দৃষ্টি হইল। তিনি দেখিলেন তাহার পূজ্য বস্তুটী শিলা নয়—ইহা সাক্ষাৎ শিখিপিঞ্ছচূড়ধারী ও মোহন মুরলীধারী শ্রীশ্রীমদনমোহন। যে শ্রীশিলা তিন বৎসরকাল শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বক্ষে চক্ষে মাথায় নাসায় ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত হইতেন, যে শ্রীশিলা কত কত দিনরজনী তাঁর প্রেমাশ্রুতে কলধৌত হইতেন, আর যে শ্রীশিলাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর বলিয়া রঘুনাথকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই শিলার সাত্ত্বিকপূজা করিলে তুমি অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ করিবে" সেই শ্রীশিলার সেবাধিকার প্রাপ্তির অধিকার লাভ অসাধারণ সৌভাগ্যের পরিচয়। ঠিক যোগ্য ব্যক্তির উপরেই মহাপ্রভু যোগ্যভার অর্পণ করিলেন। প্রভুর হস্ত প্রদত্ত এই অমূল্য অপার্থিব চিদানন্দময় উপহার পাইয়া রঘুনাথের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যথা :—

প্রভুর হস্তদত্ত এই গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥

ইহার অনুবাদ এইরূপ :—

এই শ্লোকের অর্থ আচার্য্য করেন বিবরণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
আত্মা বেচি করে তার ঋণের শোধন।

বলা বাহুল্য, প্রভুর এই কৃপোপহার প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ একবারেই বৈকুণ্ঠসুখে মজ্জিত হইলেন। তাঁহার পূজার উপকরণ কেবল তুলসী আর এক গণ্ডুষ জল। কিন্তু ইহাতেই রঘুনাথের পরমা তৃপ্তি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

জল তুলসী সেবায় তার যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচারে পূজায় তত সুখ নয়॥ (২)

রঘুনাথ এইরূপ জল তুলসী দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার সাত্ত্বিক সেবায় পরমানন্দ লাভ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে শ্রীপাদ স্বরূপ রঘুনাথের সেবায় আরও একটু নূতন বিধান করিয়া দিলেন। রঘুনাথকে প্রতি-দিন আট কৌড়ি খাজা সন্দেশ দ্বারা সেবার আদেশ করিলেন। রঘুনাথ কপর্দ্দক বিহীন। তিনি প্রতি দিন আটকৌড়ি কোথায় পাইবেন? কৃপাময় শ্রীপাদস্বরূপ শ্রীল গোবিন্দদাসের প্রতি এই খাজা সন্দেশ টুকু সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করিলেন।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা উপহার পাইলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা সেব্য বস্তু। এই শ্রীশিলার নিষবণে রঘুনাথের অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে. এই উপহার দানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই গুঞ্জমালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাদানে ভাবগম্ভীর মহা-প্রভুর ইহা ব্যতীত আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য শ্রীপাদ

(২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীমুখের উক্তি এই :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তৎসর্ব্বং ভক্ত্যোপহৃতং গৃহ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শ্রীল রামানন্দ বলেন :—

নানোপচার কৃত পূজন মাত্মবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিদ্রুতং স্যাদ্।
যাবদ্ ক্ষুধদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্নু ভক্ষ্য পেয়ে॥

পদ্যাবলী।

স্বরূপ বুঝিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার গূঢ়মর্ম্ম কেবল একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপেরই বেদ্য। শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই প্রীতি উপহার দানের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন গুঞ্জমালা দিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে শ্রীমতীর শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন, আর শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা দ্বারা মহাপ্রভু ইঙ্গিতে এই আদেশ করিলেন যে নীলাচল-লীলার অবসানে রঘুনথেকে শ্রীগোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) শ্রীপাদ স্বরূপের কৃপায় রঘুনাথেরও ইহা বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হইল না, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ

রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইলা।
গোসাঞীর অভিপ্রায়ে এই ভাবনা করিলা॥
শিলা দিয়া মোরে গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে
গুঞ্জামালা দিয়া স্থান দিল রাধিকা চরণে॥

---

(৩) শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা-দশকে শ্রীমদ্দাসগোস্বামী স্বয়ংও এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা :—

(ক) নিরুপাধি করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন।
ত্বয়ি কপটিশঠোঽপি যৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি॥
ইতিখলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্।
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

(খ) অনাদৃত্যোগীতামপি মুনিগণৈ বৈণিকমুখৈঃ।
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপিচ নিগমৈ স্তৎপ্রিয়তমাং॥
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটি দাম্ভিকতয়া।
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যাচি ব্রতমিদম্॥—স্বনিয়মদশকে।

কর্ণামৃতে (খ) চিহ্নিত পদ্যের অনুবাদ এইরূপ :—

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফুর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুণগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর অতি বলবতী কৃপার পরিচয়,—শ্রীপাদ স্বরূপের হাতে সমর্পণ এবং শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জমাল দান। শ্রীমদ্ রঘুনাথ নিজেই চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে মহাপ্রভুর এই পরম দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিত মুদ্ধৃত্য কৃপয়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি সংন্যস্য মুদিতঃ॥
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্দ্ধন শিলাং।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

ভক্ত-চরিত-লেখক পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীমদ্ রঘুনাথের পবিত্রতম চরিত কীর্ত্তনস্থলে এই দুইটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা প্রেমবিলাসে :—

আচার্য্য গোসাঞীর শিষ্য শ্রীযত্নন্দন।
রঘুনাথ দাস শিষ্য আত্ম সমর্পণ॥
বৈরাগ্য অবধি সঙ্গে করে ক্ষেত্রবাস।
তার দশা দেখি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কথোদিনে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে।
শিক্ষা করাইয়া তারে কায় বাক্য মনে॥
কারণ বুঝিল মাত্র গৌরাঙ্গ আপনে।
কেন হেন কার্য্য করেন কেহ নাহি জানে॥

হেন বাধা পাদপদ্মে করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥
হেন বাধা নাহি ভজে কৃষ্ণ করি রতি
সেই ত কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি॥
তাহার নিকটে বাস কভু যেন নয়।
সেই সে পতিত স্থান জানিহ নিশ্চয়॥
সেই স্থানে নহে যেন আমার বসতি।
ক্ষণমাত্র নহে যেন সেই স্থানে মতি॥

শৃঙ্গার ললিত রসে অধিক নিপুণ।
নিশি দিশি সহায় করে ললিতার গুণ॥
পূর্ব্ব বাক্য সিদ্ধ আছে বুঝে কোন জনা।
স্বরূপের প্রিয় করি করেন করুণা॥
আর কথোদিনে সেই দাস রঘুনাথে।
গুঞ্জা দিয়া সমর্পিলেন রাধিকার হাতে
সেবন করিতে দিলা গোবর্দ্ধন শিলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে তারে আজ্ঞা দিলা॥

রঘুনাথ সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া প্রভুর কৃপোপহারের প্রেমভক্তি পূর্ণ সেবা করেন। এই গুঞ্জমালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রিয়তম বৈভব। ভক্তি রত্নাকর বলেন:—

শ্রীকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহার।
শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া প্রেমময়ী শ্রীমতী ব্রজকিশোরীর শ্রীপাদপদ্মে ও শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রীচরণ প্রান্তে কি প্রকার আত্ম সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত স্তবাবলীতেই পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত আছে। গোবর্দ্ধনাশ্রয় দশক, এবং শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের কর্ণামৃত স্বরূপ। শ্রীরাধিকাষ্টক দাস্য ভক্তির অফুরন্ত সরস উৎস।

গিরিবর তটকুঞ্জে মুঞ্জবৃন্দাবনেশ
সরসিচ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকীর্ত্তিং।
ধৃতরতি রমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজদধিফল মশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি॥
বসতো গিরিবর কুঞ্জে
লপত. শ্রীরাধি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজদধিতক্রং
নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু।

শ্রীপাদ স্বরূপের চরণান্তিকে অবস্থান করিয়া রঘুনাথ একদিকে যেমন কঠোর বৈরাগ্য ব্রতাচরণের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন, অপরদিকে সেইরূপ ভজন নিষ্ঠারও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অহর্নিশ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর রঘুনাথ যেরূপ আহার্য্যে জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন, সে কাহিনী অতীব অদ্ভুত।

কঠোর বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা।

পূর্ব্বে পুরীর পসারীরা মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিত, এখনও করে। দুই তিন দিনেও যে প্রসাদ বিক্রীত হইত না, তাহা দুর্গন্ধ হইত, সুতরাং বিক্রয়ের এবং লোকের আহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইত, পসারীরা অগত্যা তাহা গাভীদিগের সম্মুখে ফেলাইয়া দিত। পচা গন্ধে গাভীগণও সেই পর্য্যুষিত প্রসাদ খাইতে পারিত না। রঘুনাথ রাত্রিযোগে সেই প্রসাদ ঘরে আনিয়া জল দিয়া ধৌত করিতেন। উহার মধ্যে যাহা একটু দৃঢ় অগলিত বলিয়া বোধ হইত, রঘুনাথ একটু লবণ দিয়া সেই মহাপ্রসাদ অমৃত তুল্য মনে করিয়া আহার করিতেন। যথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

> প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
> দুই তিন দিন হলে ভাত সড়ি যায়॥
> সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভী আগে ডারে।
> সড়া গন্ধে তৈলেঙ্গা গাভী খাইতে না পারে॥
> সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি
> ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি॥
> ভিতরের দৃঢ়ভাত মাজি যেই পায়।
> নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

রঘুনাথের এইরূপ প্রসাদ ভক্ষণ একদিন শ্রীপাদ স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। শ্রীপাদ আসিয়া বলিলেন "রঘু, তুমি প্রতিদিন একাকী এই অমৃত

খাইতেছ, আমাদিগকে ইহার কিঞ্চিৎ দিতে নাই কি ? এ তোমার কি প্রকৃতি ? আমাকে কিছু দাও" এই বলি। স্বরূপ সেই সড়া প্রসাদ সেবন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। শ্রীমদ্ রঘুনাথ যখন আর এক রাত্রিতে এই প্রকার প্রসাদ, ধৌত করিতেছিলেন, শ্রীল গোবিন্দ দাসের প্রমুখাৎ মহাপ্রভু এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি শুনিতে পাইলাম তোমরা অতি অপূর্ব্ব প্রসাদ ভক্ষণ কর, আমি বঞ্চিত হইব কেন ?" এই বলিয়া রঘুনাথের নিকট হইতে এক গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্বীয় শ্রীবদনকমলে প্রদান করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপও সেখানে ছিলেন।

রঘুনাথ ভীত ও অপ্রতিভ হইলেন। মহাপ্রভু যেই আর এক গ্রাস তুলিয়া হাতে লইলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ অমনি মহাপ্রভুর হাতে ধরিয়া বলিলেন "হয়েছে, থাম, ইহা তোমার যোগ্য নহে", ইহা বলিয়া মহাপ্রভুর হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, প্রতিদিন কত রকমের প্রসাদ সেবন করি, কিন্তু বলিতে কি এমন স্বাদ কোনও প্রসাদে পাই নাই।" যথা শ্রীচরিতামৃতে :

একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবার নাহি দাও, কি তোমার প্রকৃতি।
গোবিন্দের মুখে প্রভু সেই বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন তাহা আসি কহিতে লাগিলা।
খাসা বস্তু খাও সবে আমায় না দেও কেন ?
এত বলি এক গ্রাস করিয়া ভক্ষণ॥
আর এক গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিল।
"তোমার যোগ্য নহে" বলি কাড়ি নিল॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥

রঘুনাথ বৈরাগ্যের মহান্ অবতার। মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপদেশ

দিয়া ছিলেন, "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে," মহাপ্রভু আরও উপদেশ দিয়াছিলেন :—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি দায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

রঘুনাথ অতীব সতর্কতার সহিত মহাপ্রভুর এই আদেশবাণী প্রতি পালন করিয়া সাক্ষাৎ মহাপ্রভুকেও বিস্মিত ও পরম আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। জিহ্বার লালসে বৈরাগ্য নষ্ট হয়, কৃষ্ণস্মৃতি একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আহারের সহিত মনের নিগূঢ় যে একটী সম্বন্ধ আছে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত। রঘুনাথ কি পরিমাণে রসনা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উক্ত ঘটনা তাহারই প্রমাণ। দীনতা, নিরভিমানতা ও ইন্দ্রিয়-বিজয়, ভজন সাধনের প্রধান সম্বল। ভজন সাধনের এই সকল নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যেন শ্রীমদ্ দাসগোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীমদ দাসগোস্বামী ভজননিষ্ঠা নিয়মের মূর্ত্তিমান দেবতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছেড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥

পাছে বা রসনার বশীভূত হইতে হয়, পাছে বা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়, এই ভয়ে রঘুনাথ সর্ব্বদাই ভীতভীত থাকিতেন। প্রাণরক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইত, "হায় উদরের জন্য না জানি কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
[illegible]

এইরূপ কঠোর বৈরাগ্যে ও ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের নখচন্দ্রের বিমল সুধাপান করিয়া শ্রীপাদ স্বরূপের আশ্রয়ে রঘুনাথ পরমানন্দে ষোড়শ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময় ব্যাপিয়া গৌর-শশীর অমল কিরণচ্ছটায় রঘুনাথের হৃদয় প্রেমতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়া চলিল।

মহাবিরহ ও শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা।

নীলাচলে শ্রীগৌর-শশীর চরণামৃতে এবং শ্রীপাদ স্বরূপের কৃপাসুধায় ষোড়শ বর্ষকাল রঘুনাথ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দিনযামিনী যাপন করিতেন। কিন্তু সহসা তাঁহার এই সুখের দিনের অবসান হইয়া গেল। নীলাচলের পূর্ণশশী হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। নীলাকাশের পূর্ণচন্দ্র সহসা ঘনকৃষ্ণ মেঘের আড়ালে লুকাইলেন। চারিদিক্ অন্ধকারে ছাইল, চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইল, ভক্তগণ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, অবাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। শোকের ঘনকৃষ্ণ বিষাদ-ছায়ায় নীলাচলের উজ্জ্বলতা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, অবিরল কীর্ত্তনানন্দ ভীষণ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। অতঃপরে সেই আনন্দের নিকেতন শ্রীধামে কেবল "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া হাহাকার রব, কেবল প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আর কেবল শোকাকুল কতিপয় ভক্তের শোকাশ্রুধারা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সাধের কুঞ্জ শুখাইয়া গেল, ফুল আর ফুটিল না, ভক্তভ্রমরের কীর্ত্তন-গুঞ্জন নীরব হইল। নীলাচলের মধু ফুরাইয়া গেল।

শ্রীপাদ স্বরূপও শ্রীশ্রীগৌরশশীর অনুগমন করিলেন। রঘুনাথ এই মহাবিরহে একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি আর নীলাচলে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, দেহবন্ধ শিথিল হইল, জগৎ শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। এমন কি নিজের জীবনধারণও দুর্ব্বিসহ ভার বলিয়া বোধ হইল। রঘুনাথ মনে করিলেন, "আর কেন,— মহাপ্রভু গেলেন, স্বরূপ গেলেন, এখন নিলাজ প্রাণ দেহে রহিল কেন? আর জীবনধারণে ফল কি? এ জীবন এখনও শুধুই মরু, এ জীবন এখন

ভীষণ শ্মশান! তবে আর ক্লেশভোগের জন্য এ জীবন ধারণ করি কেন? এখন মরণই মঙ্গল, এখন মৃত্যুই বন্ধু। একবার হা গৌরাঙ্গ বলিয়া নির্জ্জন স্থানে এ দেহপাত করি না কেন?"

রঘুনাথ মনে করিলেন, "এ প্রাণ রাখিব না, নিশ্চয়। তবে একবার শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করিতে হইবে।" রঘু তখন প্রভুদত্ত শ্রীশিলার পানে চাহিলেন, রঘুনাথের নয়ন দিয়া মুক্তমালার ন্যায় কয়েক বিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। রঘু স্থির করিলেন গোবর্দ্ধনেই এ দেহপাত করিব। দেহপাতের পূর্ব্বে একবার সেই ভ্রাতৃযুগলের চরণ দর্শন করিব,—মহাভাগবত শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধনে যাইব, সেখানে ভৃগুপাতে প্রাণত্যাগ করিয়া এই বিরহজ্বালার শান্তি করিব।" এই মনে করিয়া রঘুনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া তাঁহার নিকট অনুমতি লইলেন, মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীধামের নিকট চিরবিদায় লইলেন। গুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা সঙ্গে লইয়া ষোড়শ বর্ষ প্রেমানন্দে অবস্থানের পরে রঘুনাথ আজ মহাবিষাদের শোকাশ্রুতে পরিসিক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

প্রভুর বিয়োগে স্বরূপের অদর্শনে।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবনে॥

শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। শ্রীগৌর-রূপী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মুখকান্তি রঘুর হৃদয়ে উদিত হইলেন, শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল। শোকসময়ে সুহৃদের দর্শনে শোকের বেগ প্রথমতঃ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু পরে সুহৃদগণের সন্দর্শনে ও সহানুভূতির সুমধুর আলাপে অনেক পরিমাণে শোকবেগ লাঘবও হইয়া থাকে। রঘুনাথ বহুদিন পরে তাঁহার চিরসুহৃৎ প্রাণারাম হৃদয়বন্ধু ভ্রাতৃযুগলের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীমদ্ রূপসনাতনের পাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া রঘুনাথ কৃতার্থ হইলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় দশম পরিচ্ছেদে :—

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগী কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥

প্রভু সমর্পিল তারে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইল বৃন্দাবন
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন।
আসি রূপসনাতনের বন্দিল চরণ

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথ।

মহাভাগবত ভ্রাতৃযুগল শ্রীপাদ রঘুনাথকে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন। বহুদিনের পরে প্রেমাস্পদ ভ্রাতার ভ্রাতাকে দেখা হইলে হৃদয়ে যেমন আহ্লাদের সঞ্চার হয়, এই ভীষণ শোকের সময়েও তখন এই তিন জনের হৃদয়ে শোকমিশ্র আহ্লাদের সঞ্চার হইল। ইহাদের মধুর সম্ভাষণে, ইহাদের প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনায় ও নির্বন্ধ-অনুরোধে রঘুনাথ ভৃগুপাতে মরণের বাঞ্ছা ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথকে তাঁহারা সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:

তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ যে পরম সুহৃদ্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকার প্রারম্ভে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা:—

রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টো।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।

স্যাতামুভৌ যত্র সুহৃৎ সহায়ৌ
কো নাম সোঽর্থো নভবেৎ সুসিদ্ধঃ ॥

ফলতঃ রঘুনাথের বয়স শ্রীপাদ সনাতনের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও শ্রীপাদ সনাতন এই বৈরাগ্যাবতার রঘুনাথকে বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিস্তারের সহায় ও সুহৃদ্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শ্রীল সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয়ও লঘুতোষিণী টীকায় শ্রীমদ্ রঘুনাথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং অতি অল্পাক্ষরে তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল পবিত্র চরিত্রচ্ছবি সুচিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্যথা :—

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা।
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দিব্যতি ॥
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভর মতীতৈবানয়োর্ভ্রাজতো।
স্তথ্যস্তস্থ পদং মত ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

রঘুনাথ দাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে।
বৃন্দাবনে গেলা যৈছে না পারি কহিতে ॥
সনাতন রূপ রঘুনাথ এক তিনে।
রঘুনাথ চেষ্টা দিক্‌বিদিক ভুবনে ॥

গোস্বামি গ্রন্থের পরিচয়ে শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন :

রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রস্যমীয়ুষঃ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতঃ কৃতিযুদিতন্ ॥

যে সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েন তখন সেখানে এই ভ্রাতৃযুগলের নাম সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত, শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহাদের অখণ্ড প্রতাপ। পাণ্ডিত্যে, ভজননিষ্ঠায়, বৈরাগ্যে ও বিনয়ে ইঁহারা "গোস্বামী" খ্যাতি লাভ করিয়া তখন সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও সুপূজিত। শ্রীমদ্ রঘুনাথ সর্ব্ব বিষয়েই ইঁহাদের তুল্য হইয়াছিলেন এইজন্যই ভ্রাতৃযুগল ইঁহাকে সহোদর তুল্য বা "মিত্র" বলিয়া মনে করিতেন, কেননা "একক্রিয়ো ভবেন্মিত্রম্" অর্থাৎ তুল্য ক্রিয়ানুরক্তিই মিত্রতার হেতু। ফলতঃ রঘুনাথ অচিরেই ইঁহাদের বন্ধু মিত্র সুহৃদ্ সখা ও সহায় হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ

একমুহূর্ত্তও ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, ইঁহারা যে ভাবে ভজন সাধন করিতেন তিনিও তদ্গত ভাবে সেইরূপ ভজননিষ্ঠার অনুশীলন করিতেন। এই তিনজনকে লোকে একপ্রাণ বলিয়া জানিত। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদ্ রঘুনাথ "শ্রীমৎ দাস গোস্বামী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

কিন্তু বিনয়খনি শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই ভ্রাতৃযুগলকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। মনঃশিক্ষার তৃতীয় শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন :—

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজনু।
যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতু মারাদভিলষঃ॥
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি।
স্ফুটং প্রেম্নানিত্যং স্মর নম তদা শৃণু মনঃ॥

অর্থাৎ হে মন, শ্রবণ কর, তুমি যদি জন্মে জন্মে ব্রজভূমিতে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীপাদ স্বরূপ ও স্বগণসহ শ্রীরূপ এবং শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীপাদ সনাতনকে ভক্তিসহকারে নিত্য স্মরণ ও নিত্য নমস্কার কর।

তিনি তৎকৃত "স্বনিয়ম দশকেও" এইরূপ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—

গুরৌমন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর শচীগর্ভজপদে।
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে॥
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে।
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে, গুরুদত্ত মন্ত্রে, শ্রীনামে, শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে, শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীতে, শ্রীপাদ রূপে এবং গণাগ্রগণ্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীতে, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনে, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরাপুরীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তে ও ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার নিত্য পরমা রতি থাকুক।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ বৈরাগ্যের স্ফুট মূর্ত্তি,—ভজন সাধনের আদর্শ। তথাপি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তিনি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিচরণের অনুসরণ

কাঁবরা তাহাকে আদর্শ মনে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের ভজনে প্রবৃত্ত হই লেন। শ্রীরূপ যে তাহার শিক্ষাগুরু এবং তিনি যে তাঁহার পদানুসরণ করিয়াই ভজন করিতেন, তৎকৃত অভীষ্টসূচন স্তবে তাহা ব্যক্ত আছে, যথা :—

যদ্ যত্নতঃ শমদমাত্মবিবেকযোগৈ
রধ্যাত্মলগ্ন অধিকার মভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক
মাসাদ্য মাদ্যতিহরেশ্চরিতৈরিদানীং॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ রূপের যত্নেই আমার মন, শম দম আত্মবিবেক ও যোগ দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া পরম তত্ত্বে সংলগ্ন হইয়াছিল। এখন তাঁহার কৃপাতেই আমার মন শ্রীভগবানের লীলাসম্ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।” ফলতঃ শ্রীমদ্ রঘুনাথ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের সজীব ও লীলাময়ী মূর্ত্তি।

অপিচ প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে :—

অপূর্ব্ব প্রেমাব্ধেঃ পরিমল পয়ঃ ফেন নিবহৈঃ।
সদা যো জীবাতু র্য মহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্॥
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো।
নিরালম্ব সোঽযং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর বিয়োগে শ্রীমদ্ রঘুনাথ বলিতেছেন—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কৃপা করিয়া অপূর্ব্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমল-জলের ফেণসমূহ দ্বারা মাদৃশ জনকে যেরূপ পরিসিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি আমার জীবনোপায় ছিলেন। সম্প্রতি আমি আশ্রয়শূন্য হইয়াছি। আমি এখন দাবানলগ্রস্ত। আর এখন কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ?”

শ্রীমদ্ রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এই দুই ভ্রাতার কৃপানুগ্রহ ও মিত্রতা লাভ করিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থির হইলেন। ভৃগুপাত দ্বারা তাঁহার মরণের বাসনা তিরোহিত হইল।

শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ ভ্রাতৃদ্বয় রঘুনাথকে পাইয়া স্বীয় সঙ্গে

দরের ন্যায় মনে করিতেন। এই সময়ে উঁহারা শ্রীমদ্ রঘুনাথের নিকট শ্রীগৌরচরিত শ্রবণ করিতেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথ মহাপ্রভুর সুধাময়ী লীলা বর্ণন করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, নয়নজলে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসিয়া যাইত গদ্গদভাবে বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিতেন না—কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, রঘুনাথ অতি কষ্টে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেন। শ্রোতৃবর্গেরও এই দশা উপস্থিত হইত। সম্ভবতঃ রঘুনাথ এই সময়েই শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব কল্পবৃক্ষ স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই স্তোত্র দুইটী শ্রীগৌরভক্তগণের হৃৎকর্ণের রসায়নস্বরূপ। সুতরাং এ স্থলে উহার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। আমরা উহার প্রাচীন পদ্যানুবাদও প্রকাশ করিলাম। পদ্যানুবাদদ্বয় ১২৮০ সালে প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম।

হরিদৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং।
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তমসখীবাপ্তুমভিতং॥
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর গৌরৈকতনুভাক্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ॥ ১॥

শ্রীব্রজমণ্ডল মাঝ, ব্রজ নব যুবরাজ,
রসরাজ-মাধুর্য্য সাগর।
রাধা প্রিয়তম সখী, মাধুর্য্যে পরম সাক্ষী,
নিরপেক্ষ প্রেমের আকার॥
রাধিকার অনুরাগ, বাড়াইতে মহাভাগ,
গোপনে করিয়া নটবেশ।

দর্পণে দেখেন রূপ, ত্রিজগতে অপরূপ,
স্বমাধুর্য্য অশেষবিশেষ ॥
নবঘন নীলাঞ্জন, প্রভৃতি উপমাগণ,
কোথা গণি সেহো মূলতম।
সে গাম্ভীর্য্যে ডুবে যায়, সত্যসুখবোধ্যদ্বয়,
শ্যামল সুন্দর নিরুপম ॥
উজ্জ্বল কিরণ তায়, উছলে বিজুলি প্রায়,
রাঙ্গা আঁখি রাধা-অনুরাগে।
নয়ন ঝাঁপিয়া পৈশে, হৃদয় চাপিয়া বৈসে,
এরূপ বারেক যারে লাগে ॥
মন করে উদাসীন, জলবিন্দু যেন মীন,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে।
সুধু রূপের এত ছটা, তাহাতে ভূষণ ঘটা,
পিতাম্বর বেণু শোভে তাহে ॥
শুক্ল সুনির্ম্মল জ্যোতি, রক্ত অনুরাগ রতি,
অন্তরে অন্তরে হিরণ্ময়।
স্নিগ্ধ মুগ্ধ চিদাকাশ, শ্যামল বিমল ভাস,
শবল বিচিত্র জ্যোতি তায় ॥
আশা মাত্রে পাপ নাশি, উপজায় পুণ্যরাশি,
চিত্ত শুদ্ধি ভক্তি-মুক্তি দিয়ে।
রাখিয়ে দুঃখের পারে, প্রেম দিয়া মন হরে,
এ বন্যায় কে পলাবে ধেয়ে ॥
সে রূপের নিরীক্ষণে, জগত জনার মনে,
বহুমানে ধাতার কৌশল।
অহো ধাতা দয়াময়, জুড়াইতে তাপত্রয়,
রূপে বিশ্ব করিলো শীতল ॥
নয়ন নিমেষ দুঃখে, মীনচক্ষু বাঞ্ছে লোকে,
প্রতিক্ষণে নব নব শোভা।

এ রূপের কিবা শক্তি, উপজায় প্রেমভক্তি,
নিরবধি জগ-মনোলোভা ॥
এই মত আত্মা হেরি, বিচার করেন হরি,
স্বমাধুর্য্য করি অনুভব।
রাধাভাবে যদি দেখি. রাধা সম হব সুখী,
যে সুখ বিষয়ে অসম্ভব ॥
মিলিয়া রাধার সনে, রাধাভাব লইয়া মনে,
রাধা ধ্যানে রসিক শেখর।
শ্রীরাধার ঐকান্তিক, অনুরাগ স্বাভাবিক,
সেই ভাবে মন গব-গব ॥
বিচারিতে বাড়ে রতি, ধরিয়া রাধার দ্যুতি,
কি আশ্চর্য্য গৌড়মণ্ডলে।
আর এক নিজ মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গ মধুরাকৃতি,
শচীগর্ভে জাত বিপ্রকুলে ॥
সকল রূপের ভুপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ,
হেরিবে এমনি হয় মনে।
রসিক শেখর হরি, অঙ্গে মাখা রাইকিশোরী,
অনুরাগী আপন ভজনে ॥
সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো।
মুহুর্গোবিন্দাদ্য দ্বিশদ পরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ ॥
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ কমল নীরাজিতমুখঃ।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২।

একপে গৌরাঙ্গ রূপে. অবতীর্ণ নবদ্বীপে,

লোক ত্রাণ প্রেমাবেশে, বৃন্দারণ্য অভিলাষে,
সংন্যাস করিলা অতঃপর ॥
নবদ্বীপের ভক্তগণ, বিরহেতে অচেতন,
জীবন চৈতন্য কৃপা বর্ষে। .
মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে, স্থিতি জানি সবে চলে,
প্রত্যব্দ দর্শন রসতর্ষে ॥
ক্ষেত্রবাসী সর্ব্বত্যাগী, ভক্তগণ সহযোগী,
নানা রসে ভজে রসরাজে।
কেহো স্নেহ কেহো সখ্য, কেহো দাস্য কেহো মুখ্য,
নিজ নিজ মনোমত কাজে ॥
পরম আনন্দ পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী,
পরম প্রণয় মধুরসে।
চৈতন্যে করান স্নান. পুরীদেব ভগবান্,
অলৌকিক প্রণয় বিশেষে ॥
গোবিন্দ নামক ভক্ত, পাদসেবা অনুরক্ত,
গুরু নিয়োজিত দয়াদাস।
গোবিন্দ সমান ভাগ্য, কে হইবে তার যোগ্য,
দেবতার যাহে অভিলাষ ॥
স্বরূপ দামোদর নাম, উজ্জ্বল প্রেমের ধাম,
রাধিকা সখীর সমভাবে।
চৈতন্যের মর্ম্ম জানে, প্রাণ কোটি নির্ম্মঞ্ছনে,
শ্রীমুখ মার্জ্জনে সদা সেবে ॥
সেরূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন মোর সাথে ॥
দধানং কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং।
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি দ্যুতিভি রভিতঃ সেবিত তনুঃ ॥

মুদা গায়ন্নুচ্চৈ নিজ মধুর নামাবলিমসৌ।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

সকল রূপের ভূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ,
অরুণ কৌপীন বহির্বাস।
প্রকাণ্ড দীঘল তনু, কনক পর্ব্বত জনু,
কান্তি ভরে চৌদিগ প্রকাশ ॥
প্রেমানন্দ রস ভরে, নাম সঙ্কীর্ত্তন করে,
মধুর গম্ভীর স্বর ধাম।
বলে দুঃখহারি কৃপাবর্ষ, চিত্তাকর্ষি রসোৎকর্ষ,
রতিদাতা হরেকৃষ্ণ রাম ॥
সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈ ভক্তি-নিপুণৈঃ।
শ্রুতে গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস ফলাং ভক্তিলতিকাম্ ॥
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতি কৃপাভিঃ প্রকটয়ন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

এ গৌড়মণ্ডলে প্রভু দয়ালু চৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া ভুবন কৈল ধন্য ॥
প্রকটিলো ভক্তিলতা পরম মঙ্গল।
সে লতার ফুলে প্রেমোজ্জ্বল রস ফল ॥
চৈতন্য দর্শনে ব্রজ ভাবে কৃষ্ণরতি।
রাগমার্গে ঈশ্বরের ভজনে প্রবৃত্তি ॥
পূর্ব্ব মুনিগণ সবে এ ভক্তি বাঞ্ছিলো।
আজ্ঞা বিনা জানাইতে তাহারা নারিলো ॥
কর্ম্ম জ্ঞান বৈধী ভক্তি বৈধঅনুরাগ।
এই সব প্রকাশিল পূর্ব্ব মহাভাগ ॥

গোপিকার মত নিরপেক্ষ অনুরাগে।
ভজন যোগ্যতা স্ফুরে প্রভু কৃপাযোগে ॥
তাদৃশ যোগ্যতা বিনে তাদৃশ প্রসাদ।
রাসলভ্য নহে যাতে লক্ষ্মী করে সাধ ॥
কাম রতি ধৈর্য্য রতি স্বাভাবিক রতি।
স্বভাব সমর্থা রতি গোকুল যুবতি ॥
সেই অধিকারী অন্তরঙ্গ শিরোমণি।
আত্মতত্ত্ব রহস্য প্রকাশ পাত্র মানি।
শ্রুতিগণ এই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
পরা ভক্তি প্রশংসনে প্রাপ্ত গোপীগণে ॥
হেন ভক্তি প্রচারিলো শচীর নন্দন।
হেন কি হইবে পুন মিলিবে দর্শন ॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্।
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন বিধিনা কীর্ত্তরত ভোঃ ॥
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনকইব তেভ্যঃ পরিদিশন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

গৌড়বাসী জনে, নিজজন জ্ঞানে,
বিশেষে করিয়া স্নেহ।
পুত্র প্রায় করি, শিখায়েন হরি,
হরে কৃষ্ণ বলি নেহ ॥
যদ্যপি চৈতন্য, বিশ্ব কৈল ধন্য,
সকলে সমান দয়া।
ভাষাদি সমতা, দেশীয় মমতা,
গৌড়ীয়ে অধিক মায়া ॥
গৌড়বাসী সবে, অসাহসী ভাবে,
পূর্ব্বে ছিলা অবজ্ঞাত।
চৈতন্য প্রভাবে, বিদ্যা বুদ্ধ সবে,
রাজগণ অভিমত ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবে, চৈতন্য বৈভবে,
ভজন-রস গভীর।
হেন কি হইবে, পুন দেখা দিবে,
চৈতন্য করুণা-বীর॥

পুরঃপশ্যন্নীলাচলপতি মুরুপ্রেম নিবহৈঃ।
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজ দীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়িগরুড়স্তম্ভ চরমে।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ॥ ৮॥

নীলাচলেশ্বর, পরম অক্ষর,
নীলাঞ্জন-ঘৃণাকর।
ঈশ্বর ভজনে, অনুরাগ মনে,
প্রভু করে সাক্ষাৎ কার॥
প্রেমানন্দ ভরে, নেত্রবারি ঝরে,
আনন্দ বৈবশ্য ভয়ে।
নিকটে না উঠে, গরুড় নিকটে,
দর্শন লাগিয়া রহে॥
আপনি অদ্বয়, ভজন বিষয়,
আপনি ভকত ধীর।
হেন কি হইবে, পুন দেখা দিবে,
চৈতন্য করুণাবীর॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টাদ্যুতি বিজিত বন্ধুকমধুরং।
করং কৃত্বা বামং কটি নিহিত মন্যং প্রবিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেমাগণিত পুলকো নৃত্য কুতুকী।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ॥ ৭।

চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত, সঙ্কীর্ত্তনে অনুরক্ত,
মাঝে নাচে চৈতন্য চন্দ্রমা।
কদম্ব কেশর জিনি, প্রব্যক্ত পুলক শ্রেণি,
প্রভু প্রকাশেন প্রেমলীলা॥

আনন্দ উদ্রেক আর্ত্তি, মাতিল ভক্তের প্রতি,
দাঁধুলি অধরচাপে দন্তে।
কটিতটে বামকর, দক্ষ বাহু ঊর্দ্ধতর,
সেই শোভা ধাইল দিগন্তে॥
যাবেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে॥

সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গোকুলবিধো।
নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়নজলধারা বিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছা সঞ্চন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্যতি পুনঃ॥ ৮॥

সরিতীরে উপবন, মধ্যে শ্রীশচীনন্দন
উদ্দীপন কৃষ্ণের বিরহ।
নয়ন গলিত জলে, অপরূপ নদী চলে,
মুহূর্মুহু অনুভবে মোহ॥
সেই দশা যে দেখিলো, তার কিবা দশা হৈলো,
মৃতপ্রায় নাহিক সম্বিৎ।
তাব তাতে গৌরহরি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
ইহা বলি সকলে মোহিত॥
যাবেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষিতে।
নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন মোর সাথে॥

শচীসূনোরষ্টাষ্টক মিদ মভীষ্টং বিরচয়ৎ।
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতি.বিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ॥
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতি কৃপাবেশবিবশঃ।
পৃথুপ্রেমাম্ভোধৌ প্লাবিত বসদে মজ্জয়তি তং॥

শ্লোক পড়ি প্রেমযোগে, গৌরাঙ্গ দেখেন আগে,
শ্রীদাস গোস্বামী মহামতি।
অষ্টকে অভীষ্ট দিলো, আপনে প্রতীত হৈলো,
আশীর্ব্বাদ করে লোক প্রতি
শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, সর্ব্বাভীষ্ট সম্পাদক,
দৈন্য করি পড়ে যে সুমতি।
শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁরে, ডুবাবেন প্রেমসাগরে,
সদয় হইয়া তাঁর প্রতি ॥
ইতি শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামি বিরচিত শ্রীশ্রীশচীনন্দাষ্টকম্।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষঃ।

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ গজবর্য্যেঽখিলজনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকারনিবহম্।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচল মধরয়ৎ শীধুচ বচ
স্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

সকল জনার মন, করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে, সে মন ফিরাতে নারে,
মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র গতি,
গজ সে অন্যান্য মদে মাতা।
গৌরাঙ্গ বদন হেরে, সকলঙ্ক চন্দ্রপরে,
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥
গৌরকান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিবো।
গৌরাঙ্গ মধুর বাণী, তরঙ্গ অমৃত জিনি,
পিলে মন করে পিব পিব ॥

আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ১॥
অলংকৃত্যাত্মানংনববিবিধ রত্নৈরিব বলাদ্॥
বিবর্ণত্বস্তম্ভা স্ফুট বচন কম্পাশ্রু পুলকৈঃ॥
হসন্ স্বিদ্যন নৃত্যন্ শিতি গিরিপতে র্নির্ভরমদে।
প্রবঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদবন্মাং মদয়তি॥ ২॥
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি ভাবরত্ন সাজ॥
বৈবর্ণ্য স্তম্ভত্ব আর, গদ্গদ বচনোচ্চার,
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
শ্রীরাধার ভাব সার, করি হরি অঙ্গীকার,
জীবে শিখাইতে প্রেম ধর্ম্ম॥
নামরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
হেরি জগন্নাথ প্রমুদিত।
সে রস যে নিরখিলো, সেহো সে রসে মাতিলো,
মোর মন করে উন্মাদিত॥
আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ২॥
রসোল্লাসৈ স্তির্য্যগ্ গতিভি র্ভিতো বারিভিরলং।
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোঁকা স্নরুণ জলযন্ত্রভ্রমিতয়োঃ॥
মুদা দন্তৈর্দষ্টা মধুর মধুরং কম্প চলিতৈ।
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৩॥
রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাসভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
দুনয়নে বহে প্রেমধারা॥

অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত উৎসব কালে, সেচন করয়ে জলে,
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে॥
সকম্প আনন্দাবেশে, দর্শনে অধর দংশে,
হেন প্রেম আছিল কোথায়।
একবার যেবা হেরে, তাঁর আঁখি মন হরে,
মোর মন সতত মাতায়॥
আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ৩॥

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি সুতস্যোরু বিরহাৎ।
শ্লথ চ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ॥
লুঠন্ ভূমৌ কাক্কা বিকলবিকলং গদ্‌গদ বচা।
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৪॥

একদিন কাশীমিশ্রালয়ে।
বসিয়াছে মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভু,
হেন ভাব উদয় হৃদয়ে॥
শ্রীনন্দ নন্দন হরি, বিরহ আবেশে ভরি,
অঙ্গ সন্ধি সব শ্লথ হৈল।
ভুজ পদ দীর্ঘাকার, গদ্‌গদ বচনোচ্চার,
ভূমে লুঠে কাঁদে সবৈকল্য॥
আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ৪॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয় মুরুচ ভিত্তিত্রয় মহো।
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক সুরভি মধ্যে নিপতিতঃ॥

তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহা
দ্বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শয়ন মন্দিরে গোরারায়।
কৃষ্ণের বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥
কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিতা সদা,
কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান।
এই মত আচম্বিতে, কৃষ্ণবেণু গান শুনিতে,
সেহেতু বাহিরে যেতে চান ॥
তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ ঊর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাইর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে ॥
ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কুর্ম্ম তায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
হেরে কুর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে ॥
আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ।
প্রলাপাদুন্মাদাৎ সতত মতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ॥
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন বিধু বর্ষণ রুধিরং।
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

একদিন আপন, প্রাণার্বুদ সম,
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ বিকল মতি,
অবিরত উন্মাদে উজোর ॥

বাহিরে যাইতে মন, যাইতে না পেয়ে পুন,
ভিতে ঘর্ষে বদন সরোজ।
অপরূপ প্রেমরাশি, গৌররূপ সুবিলাসী,
হেরি মোহে কোটী মনোজ।
এহেন গৌর রসরাজ, স্বানুভবে নটরাজ,
হৃদয় মন্দির মাঝে মোর।
না জানি সে যে কেমন, কেমন কেমন করে মন,
উন্মাদে সে হয় বিভোর॥

আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমারে নিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু। ৩।

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্তরিত মিহ তং লোকয় সখে।
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপ মভিবদন্নুন্মদ ইব
দ্রুতংগচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত তদ্।
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৭॥

একদিন গোকুলচাদে, দরশনে মনসাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায়।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমাধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত গোরারায়
তারে কহে ওহে শুন, তুমি মোর বন্ধু আপন,
কোথা মোর, প্রাণগোবিন্দ।
প্রভুর সম্ভাষ বাক্য, কহিল দৌবারিক,
বুঝিয়া সে ভাব অনুবন্ধ॥
ত্বরিতে চলহ দেখ, তোমার সে প্রাণসখ,
এত শুনি ধরে তার হাত।
রাধিকা ভাবিত মতি, আপনি গোকুল পতি
আপন বোলয়ে প্রাণনাথ॥

আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
সদায় উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক গিরিরাজস্য কলনা।
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ॥
ব্রজন্নস্মীত্যুক্তা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো।
গণৈঃ স্বৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

নীলগিরি নিকটে চটক গিরিরাজ।
তাহা দেখি ভাবে মত্ত গোরা রসরাজ ॥
কহে আমি চলিলাম গোকুল মাঝারে।
তাঁহা গোবর্দ্ধন গিরিপতি দেখিবারে ॥
যথাপথ নাহি জানে উন্মাদের প্রায়।
হেনকালে নিজগণে ধরেন তাঁহায় ॥
সে গৌরাঙ্গ হৃদয় মন্দির মাঝে মোর।
উদয় হইয়ে মোরে করয়ে বিভোর ॥

আর মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
সদায় উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৮ ॥

অলং দোলাখেলা মহসি বর তন্মণ্ডপ তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর নিজ গণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নামাংমতি মধুর গানং মুরভিদঃ।
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

দোল মহোৎসব কালে, বসি দোলমঞ্চ তলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সঙ্গে।
আপনি গৌরাঙ্গ রায়, নিজ নাম গান গায়
পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তরঙ্গে ॥

সে রঙ্গ যে নিরখিলো, প্রেমামৃতে সে মজিলো,
আর কি ভুলিতে পারে কভু।
হৃদয় উদয় করে, সতত মাতায় মোরে
প্রেমসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতি রলং।
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ ॥
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল সুবলে।
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

গোবিন্দ নামক ভক্তে, তারে দয়া অবিরত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি।
পুরীদেবে করে ভক্তি, যেমন শ্রীযদুপতি,
গুরুবর্য্য সান্দীপনি প্রতি ॥
স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যে হেন সুবলে।
সে প্রভু ভাবিবে মনে, মন না ধৈরজ মানে,
সদা ভাসে প্রেমামৃত জলে ॥
আরে মোর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হয়ে, মাতায় আমার হিয়ে,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০।

মহাসম্পাদ্দাবাদপি পতিত মুদ্ধৃত্য কৃপয়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ ॥
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১।

আমি অভাজন জন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
সে বনে ত্রিতাপ দাবানল।
করুণাতে উদ্ধারিয়ে, স্বরূপ আশ্রয় দিয়ে,
প্রকাশিলো আনন্দ প্রবল ॥

বক্ষে গুত গুঞ্জাহার, গোবৰ্দ্ধন শিলা আর,
সোঁপিলেন দয়া করি মোরে।
এহেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দে ধৈর্য্য কেবা ধরে॥ ১১॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভাভ্রাজৎপদ্যাবলিললিতশাখং স্তবতরুং।
মুহুর্যোঽহতি শ্রদ্ধৌষধিবরবলৎ পাঠ সলিলৈ
ফলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরস গুরুতল্লোকনফলম্॥ ১২॥

এই স্তব কল্পদ্রুম, তাহে বিবিধ কুসুম-
প্রস্ফুটিত মহাভাব গণ।
শ্রদ্ধৌষধি পাঠ জলে, সিঞ্চিবে যে কুতূহলে,
ফল পাবে প্রভুর দর্শন॥ ১২॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামি বিরচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তব-
কল্পবৃক্ষঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—০—

গোবর্দ্ধনপ্রান্তে।

শ্রীমদ্ দাসগোস্বামী কিয়দ্দিন শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর চরণান্তিকে বাস করিয়া শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের নিভৃত স্থানে ভজন করার জন্য গোস্বামিপাদদ্বয়ের কৃপানুমতির প্রার্থী হইলেন। ভজননিষ্ঠ শ্রীমদ্ দাসগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গিরিরাজ দর্শনে তাঁহার নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু গিরিরাজকে দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন, আর শ্রীমতী রাধিকার শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্লোক পাঠ করিয়া অধীর ভাবে নাচিয়াছিলেন। শ্লোকটী এই ;--

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সুযবসঃ কন্দর কন্দমূলৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোবর্দ্ধনে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়া শৈলরাজের বহুসম্মান সংস্থাপন করিয়াছেন। যে দিন ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-যজ্ঞন প্রবর্ত্তন করিলেন, যে দিন তিনি স্বয়ং গোপীদিগের বিশ্বাসজনক অন্য প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পূজোপকরণ ভক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার কলেবর সাতিশয় বিশাল হইয়া উঠিল এবং যখন তিনি ব্রজবাসীদের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য, এই মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমাদের প্রতি কেমন অনুগ্রহ বিধান করিয়াছেন, সেই দিন হইতে গোবর্দ্ধনের প্রতি ব্রজবাসীদের ভক্তির সঞ্চার হইল। (১)

---

(১) কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ॥

ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গে ব্রজবাসিগণ সপ্তদিবারাত্র এই পর্ব্বতরাজের আশ্রয়েই অবস্থান করিয়াছিলেন। গিরিরাজ ব্রজবাসীদের বড় প্রিয় পদার্থ। তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া গিরিরাজের পূজা করিয়া উক্ত পদ্য পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে পরিক্রমা করিয়াছিলেন. যথা— "ধন্যোঽয়ং গিরিরাজ এব জগতি শ্রীকৃষ্ণরামো মুদা।
যত্র ক্রীড়ত এব সন্ততমহো গোপালবালৈঃ সহ।
এবং জল্পতি প্রেমপূর্ণ রসদঃ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং।
শ্রীগোবর্দ্ধনমেব সাগ্রহমপি তৎপূজয়ন্ নৃত্যতি॥

শ্রীল মুরারিগুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমদ্‌রঘুনাথকে যে গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপীনোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ॥

২৪ অধ্যায় ১০ স্কন্দ শ্রীমদ্ভাগবতম।

অপরাপর পুরাণেও গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। যথা :—
অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভং।
মথুরা পশ্চিমেভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদস্য প্রদক্ষিণং।
নতস্য পুনরাবৃত্তি র্দেবি সত্যং ব্রবীমিতে।
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিং।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে॥
ইন্দ্রস্ত বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলং।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া॥

আদি বরাহে।

গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনোধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারণাৎ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণু র্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী র্বসন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে

প্রদান করেন, নীলাচলে অবস্থান-সময়েই রঘুনাথ এই দুই পদার্থের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধা-কুণ্ডই তাঁহার ভাবী ভজন-স্থল রূপে প্রভু ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। রঘুনাথ এতদিন পরে সেই গিরিরাজের চরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধনমূলে অবস্থান করিয়া ভজন সাধন করায় শ্রীমদ্ রঘুনাথের কেমন আগ্রহ, তাহা তাঁহার স্বকৃত শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশক' এবং "শ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশক" স্তোত্র পাঠে কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্।

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ—

(১)

সপ্তাহং মুরজিৎকরাম্বুজপরিভ্রাজৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি
প্রোদ্যদ্বস্তু বরাটকোপরিমিলন্মুগ্ধ দ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃ ক্ষেপক শক্রনক্র মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

(২)

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং পরাং সুরনদীতোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভি র্যেনাভিষেকং হরেঃ।
যৎ কচ্ছেঽজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং গো-নিকরেন্দ্র পট্টশিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

(৩)

স্বর্ধুন্যাদিবরেণ্য তীর্থগণতো হৃদ্যান্তজস্রং হরেঃ
সীরি ব্রহ্মহরাপ্সরঃ প্রিয়ক তৎ শ্রীদানকুণ্ডান্যপি।
প্রেমক্ষেমরুচিপ্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ধ্রুবং
কস্তং মাদৃমুনীন্দ্রবর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

(৪)

জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহার সুমনো গৌরী বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদি সরাংসি নির্ঝরগিরিঃ শৃঙ্গারসিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জন্তি যঃ সর্ব্বতঃ
কস্তং গোমৃগপক্ষিবৃক্ষললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

(৫)

গঙ্গাকোট্যধিকং বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ প্রৌঢ়প্রসাদং দধৎ
প্রেয় স্তব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

(৬)

যত্র মাধব নাবিকো রসবতী মাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাতবলনাৎত্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনো জাহ্নবী।
কস্তং তন্নবদম্পতী প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।

(৭)

রাসে শ্রীশতবন্দ্য সুন্দর সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ কৃষ্ণরসাল বাহুবিলসৎ কণ্ঠীমধৌ মাধবী ॥
রাধা নৃত্যতি যত্র চারুবলতে রাসস্থলী সা পরা।
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

(৮)

যত্র স্বীয় গণস্য বিক্রমভৃতা বাচামুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মের ক্রূর দৃগন্ত বিভ্রম শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিদ্ধয়োঃ।
তদ্যূনো র্ব্বদান সৃষ্টিজ কলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তং পৃথুকেলিসূচনশিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।

(৯)

শ্রীদামাদিবয়স্য সঙ্ঘবৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয় চারুচারণপরো রীরীতি গায়ত্যসৌ।

রঙ্গে গূঢ়গুহাসুচ প্রথয়তি শ্যামক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌচ্ছিগভূবিভাঙ্কিততনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

(১০)

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুত্তমচ্ছেশ্বরান্
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেশ্বিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ন্।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
কস্তং শৃঙ্গিকিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

তস্মিন্ বাসদনস্থ বসাদশকং গোবর্দ্ধনস্তোত্র যৎ
প্রাদুর্ভূত মিদং যদীয় কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্গুণবৃন্দ বন্ধুরথলে জীবাতু রূপস্য তৎ
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পঙ্কং ময়া মৃগ্যতে ॥

ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকং স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশকম্।

(১)

নিজপতি ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত মদধৃষ্টোদ্দণ্ডদেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুল পৃথুল শৈল শ্রেণিভূপপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

২

প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নব যূনোর্দ্বন্দ্ব মস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তৎ দ্বয়োমে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

(৩)

অনুপম মণিবেদী বন্ধুসিংহাসনোর্ব্বী
রুহঝর দরসানু দ্রোণিসঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।

সহবল সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

(৪)

রসনিধি নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে
দ্যু'তিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য
রসিকবর কুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

(৫)

হরিদয়িত মপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম
প্রিয়সখিমিহ কণ্ঠে নর্ম্মনালিঙ্গ্য গুপ্তঃ
নবযুবযুগখেলা স্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥

(৬)

স্থলজলতলশস্পৈ ভূর্রুহচ্ছায়য়াচ
প্রতিপদ মনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজ গোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥

(৭)

সুরপতি কৃত দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব গৃহরূপ স্যান্তরে কুর্ব্বতৈব
অঘবক রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥

(৮)

গিরিনৃপ হরিদাসশ্রেণীবর্য্যেতি নাম-
মৃতমিদ মুদিতং শ্রীরাধিকা বক্ত্র চন্দ্রাৎ।
ব্রজনব তিলকত্বে ক্লিপ্তবৈদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥

(৯)

নিজ জনবৃত রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত
ব্রজনরপশুপক্ষিব্রাতসৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিত করুণত্বান্ মাধুরী কৃতাভাস্তং
নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

(১০)

নিরুপধি করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি শঠেঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তানগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥

রসদশকমস্য শ্রীল গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে
স সপদি সুখদেঽস্মিন বাসমাসাদ্য সাক্ষাৎ
শুভদ যুগলসেবা রত্নমাপ্নোতি তূর্ণম ।
ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা দশকম।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে।

শ্রীগোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইয়াই শ্রীমদ্ রঘুনাথের শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি এতদিন শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণ-কথায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধনের নিভৃতপ্রদেশে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহাপ্রভু। ও শ্রীপাদ স্বরূপের বিরহানল অধিকতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল। রঘুনাথ স- প্রভুর প্রদত্ত শিলা ও গুঞ্জমালা লইয়া একান্ত মনে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দীনতার খনি রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া অতীব দীনতা সহকারে গোবর্দ্ধন-বাসের প্রার্থনা-স্তোত্র রচনা করেন। উহার দশম শ্লোকে তিনি বলিতেছেন "গোবর্দ্ধন, আমি অতি কপটী—

আদর বৈরাগ্য কেবল লোকদেখান, আমি প্রতারক, আমি শঠ—আমার মনে এক, মুখে আর। আমি জানি, আমি তোমার নিকট স্থান পাইবার অযোগ্য। কিন্তু গিরিরাজ, আমার আর এক ভরসা এই যে তুমি আমার যোগ্যতাযোগ্যতার বিচার করিবে না। কেননা তোমার আর্ত্তপ্রিয় শ্রীশচীনন্দনই আমাকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার করুণা নিরুপধি; তাঁহার দয়ায় পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। সুতরাং হে গিরিরাজ, তুমি দয়া করিয়া আমাকে চরণান্তিকে একটুকু স্থান দাও।"

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-সমীপে কিয়ৎ কাল ভজন সাধন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ভজনাধিকার লাভ করিলেন। তিনি প্রেমময়ী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীকুণ্ডাশ্রয় করিয়া যুগলসেবারসে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীকুণ্ডের প্রোজ্জ্বল প্রভাবে (১) তাঁহার হৃদয়ে সমুজ্জ্বল

---

(১) শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস অতি অদ্ভুত ও পরমপ্রেমপ্রদ। ইহা নবলীলার আশ্রয়। অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া বৃষরূপ ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসী-মায়ার এই ছলনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অরিষ্টাসুরকে বধ করিলেন। এখানে বীররস ও অদ্ভুত রসের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিল। অরিষ্টাসুরের বধের পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী অরিষ্টাসুরের নিধন-সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "রাখাল, তোমার ঘৃণা নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধও নাই, অরিষ্ট যদি অসুর হইলেও সে একটা বৃষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল ত। তুমি গোহত্যা করিয়া কি বীভৎস কাণ্ডই করিয়াছ? ছি আমাকে ছুঁইও না তুমি অপবিত্র হইয়াছ। যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া আসিতে পার, তবে তোমার দোষ ঘুচিবে।" শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন "তীর্থের অন্বেষণে আর কোথায় যাইব, এখানেই সকল তীর্থ আনিয়া এখনতে স্নান করিতেছি।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে পদাঘাত করিলেন, আর অমনি সকল তীর্থের পবিত্র সলিলে সহসা সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল। তীর্থগণ আপন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব

নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পাইত। কিন্তু উহাঁর বহিরঙ্গ দৃশ্য তখনও জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণের উপযোগী হয় নাই। একদিন শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর মনে হইল শ্রীকুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু পরক্ষণেই পরম বৈরাগ্যশীল রঘুনাথ আত্মধিক্কার করিয়া বলিলেন "ছি ছি, আমার মনে এ কথার উদয় হইল কেন? কুণ্ডদ্বয় জলপূর্ণ করা অর্থ-ব্যয়-সাপেক্ষ। আমি নিষ্কিঞ্চন ভিখারী। আমার মনে অর্থসাধ্য-কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা আসিল কেন?" রঘুনাথ পুনঃপুনঃ আত্মধিক্কার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ-নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া নিজের মনকে অনেক প্রকারে সংযত করিয়া সাবধান ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, যথা ভক্তিরত্নাকরে:—

অকস্মাৎ রঘুনাথের মনে এই হৈল
কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল॥
অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায়॥
আপনাকে ধিক্কার করয়ে বারবার।
কেন এ বাসনা মনে হইল আমার॥

করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "এই দেখ, এখন আমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইতেছি।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলেন। ইহারই নাম শ্যামকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ তখন কৌতুক করিয়া বলিলেন আমার ক্ষমতা দেখিলে ত, তোমাদের এমন ক্ষমতা আছে কি? এখন একবার সকলে মিলিয়া এই সর্ব্ব তীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হও।" শ্রীমতী বলিলেন "তা বটে; কিন্তু শাস্ত্রের কথা এই যে—

"উদ্ধৃত্য পঞ্চমৃৎ পিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে।"

অর্থাৎ পরের জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে তাহাতে মৃত্তিকার পাঁচটা ঢিলা নিক্ষেপ করিতে হয় সুতরাং সেই ব্যবস্থা করিয়াই তোমার এই কুণ্ডে স্নান করিব।" এই বলিয়া নিজের নিখিল সখী-বৃন্দসহ মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরেই আর একটী বিশাল কুণ্ড নিখাত হইল। এই কুণ্ডে সমস্ত তীর্থ সমাগত হইয়া শ্রীমতীর

বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া।
রহয়ে নির্জ্জনে অতি সাবধান হৈয়া॥

বৈরাগ্য-বিষয়ে রঘুনাথ চিরদিনই অতি খুঁৎখুঁতে। শ্রীকুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হইলে ভাল হইত, এই চিন্তার উদয় হওয়াতেও, রঘুনাথ নিজকে মহা অপরাধীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ কখনও ভক্তের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কি

স্তবস্তুতি করিয়া আপনাদের পারিচয় প্রদান করিলেন। ইঁহারই নাম শ্রীরাধাকুণ্ড।

শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বহুল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা :—

১। অরিষ্ট রাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্য বিচারণা॥

আদি বরাহে।

২। দীপোৎসবে কার্ত্তিকেচ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভূতৈ বিষ্ণুপরায়ণৈঃ॥

মথুরা খণ্ডে।

৩। গোবর্দ্ধন গিরৌ রম্যো রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাতা হরেঃ প্রিয়ঃ॥
নরো ভক্তো ভবেৎ বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণং।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাকুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবেকো বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥—পাদ্মে।

শ্রীচরিতামৃত বলেন :—

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধামধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥

কবিগণও শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা সৌন্দর্য্য বর্ণনায় সাবিশেষ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন যথা :—

নাগরবর পরম ধীর বহি রাধাকুণ্ডতীর,
নিরখত অতি মঙ্গলময় মধুর সরসী শোভা।

প্রকারে তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত রঘুনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, সে কাহিনী অতি অদ্ভুত সে বিবরণ এইরূপ :—

জনৈক ধনী বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া শ্রীনারায়ণের পদমূলে বহু অর্থ রাখিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ধনী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন,—শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন "এই মুদ্রা এখানে রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইহা লইয়া তুমি অরিষ্ট গ্রামে যাও। সেখানে এক জন বৈষ্ণবচূড়ামণি দেখিতে পাইবে, তাঁহার নাম রঘুনাথ দাস। তাঁহাকে বলিও বদরিকাশ্রমের শ্রীনারায়ণ আপনার জন্য এই মুদ্রা পাঠাইয়াছেন। তিনি হয়তো এই কথাতে এই টাকা গ্রহণ করিবেন না। তখন তাঁহাকে বলিও, আপনি কুণ্ডদ্বয় জলপূর্ণ দেখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, স্মরণ হয় কিনা মনে করিয়া দেখুন! এই টাকা দিয়া কুণ্ডদ্বয় জলপূর্ণ করিয়া

নিরমল পরিপূরিত জল তঁহি কত কত ভাতি কমল,
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু গুঞ্জর চিত লোভা॥
লঘু লঘু নব পবন সঙ্গ উপজত মৃদুতর তরঙ্গ
প্রমুদিত জলচরচর বহু ফিরত কত রঙ্গে।
ঝকিত মণিঘটিত ঘাট চয় বিচিত্র চিত্রনাট
মণ্ডিত রুচি মণ্ডপ মদনালয়ে মদভঙ্গে॥
প্রফুল্লিত সুরসাল হি অরু নীপ বকুল চম্পক তরু
উরু রুচির-রচিত রতন দোলা তহি সাজে।
উলসিত শুক গায়ত গান শুনি উনমত বিহগণ
নৃত্যতি শিখি, কুহু কুহু কুহু কোকিল কল গাজে॥
কনক বেদী বিলসিত বন সেবিত ষড়ঋতু অনুখন
বিকসিত কত কুসুম সুষুম সৌরভ অনুপামা।
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ
ধৈরয ভয় ভঞ্জন ভণে নরহরি সুখধামা॥

জীবের দুষ্কৃতি-ফলে সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী এই শ্রীকুণ্ড অপ্রকট হইলেন। কলিহত-জীবের একমাত্র সুহৃৎ স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-

লউন, ইহা নারায়ণের আজ্ঞা বলিয়া জানিবেন।" মহাজন পরদিন প্রভাতে টাকাগুলি লইয়া অরিষ্ট গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন, যথা-সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথের চরণসমীপে আসিয়া সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন, রঘুনাথ স্তম্ভিত হইলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করা হইল। অচিরেই শ্রীকুণ্ডদ্বয় সুনির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথের বাঞ্ছাপূর্ণ হইল। এই রাধা-কুণ্ডই তাঁহার ভজনাশ্রয় হইলেন। তিনি দিনযামিনী এই শ্রীকুণ্ডতটে ভজনানন্দে বিভোর থাকিতেন।

সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া পুনর্ব্বার এই শ্রীকুণ্ড আবিষ্কার করেন. যথা, ভক্তিরত্নাকরে ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া।
এই তমালের তলে বসিল আসিয়া॥
অরিষ্ট গ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিল।
কুণ্ডদ্বয় বার্ত্তা কেহ কহিতে নারিল॥
সঙ্গেতে আইল বিপ্র মথুরা হইতে।
তারে জিজ্ঞাসিলে সেহ না পারে কহিতে॥
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ত তীর্থ নিরীখয়।
দুই ধান্য ক্ষেত্রে হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥
তথা অল্প জলে স্নান করি হর্ষচিতে।
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে॥
লই মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল।
দেখি গ্রামী লোক মহা বিস্মিত হইল॥

এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম কতিপয় ছত্র এতৎসহ অবশ্য পাঠ্য। কেননা, উহাই ভক্তিরত্নাকরের আদর্শ। প্রভুর কৃপায় শ্রীকুণ্ড প্রকাশ পাইলেন। কিন্তু তখনও কুণ্ডের বহিরঙ্গ শোভা প্রকটিত হইল না। মহাপ্রভু শ্রীদাসগোস্বামী দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

তাহার বিরচিত শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক শ্রীরাধিকাচরণপ্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক। তদ্‌যথা :—

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক।

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ।

(১)

বৃষভদনুজনাশান্নর্মধর্মোক্তিরঙ্গৈ
নিখিলনিজসখীভি র্যৎস্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞাপ্রমোদৈ
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।

(২)

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তং।
জনয়তি হৃদিভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

(৩)

অঘরিপুরপি যত্নাদত্রদেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃতকটাক্ষ প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।

(৪)

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমি র্নিকামং
ব্রজমধুর কিশোরী মৌলিরত্ন প্রিয়েব।
পরিচিত মপিনাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

(৫)

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈ-
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।

সপদি কিল মদীশাদাস্যপুষ্পপ্রশস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োঃ মে ॥

(৬)

তটমধুর নিকুঞ্জাঃ ক্লিপ্তনামান উচ্চৈ
র্নিজ পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকররুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥

(৭)

তটভুবিবরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি হৃদ্যাং
মধুর মধুর বার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥

(৮)

অনুদিন মতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি সঙ্ঘৈ
র্নবসরসিজ গন্ধৈর্হারিবারি প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥

(৯)

অবিকল মতি দেব্যাশ্চারু কুণ্ডাষ্টকং য.
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিদাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃশ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্।

শ্রীমদ্দাসগোস্বামী এই শ্রীকুণ্ডতটে বৃক্ষমূলে বসিয়া বোধিদ্রুম মূলে শাক্যসিংহের ন্যায় নির্ব্বিকল্প ভজন-সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। দিনযামিনী কিরূপ ভাবে আসিত আর যাইত, রঘুনাথের সে জ্ঞানও রহিল না। *

---

* শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে বৃক্ষমূলে শ্রীমদ্ রঘুনাথের ধ্যাননিমগ্নতার বিব রণ পাঠে বোধিদ্রুমতলে শাক্যসিংহের ধ্যানের কথা মনে পড়ে। ধ্যেয়

ভজনকুটীর ও ভক্তসমাগম।

একদিন শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বাসায় শুভাগমন করিলেন। মানসপাবন ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া দেখেন একটা ব্যাঘ্র ঐ ঘাটে জলপান করিতেছে, আর অদূরে শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ নির্ব্বিকল্প ভাবে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, ব্যাঘ্রটা জলপান করিয়া তাঁহার পাশ ঘেসিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

দিবা রাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটীর করিতে তার ইচ্ছা কভু নহে॥

*   *   *   *

রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেল তার নিকট হইয়া॥

কিছুক্ষণ পরে রঘুনাথের বাহ্যজ্ঞান হইল, চাহিয়া দেখেন সম্মুখে শ্রীপাদ সনাতন,—অমনি ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। শ্রীপাদ সনা

বিষয়ের পার্থক্য থাকিলেও ধ্যানের একাগ্রতা সম্বন্ধে এই উভয়েরই তুল্যতা আছে। শ্রীশাক্যসিংহের প্রতিজ্ঞা এই ছিল—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
ন প্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, ত্বগস্থিমাংস বিলয় হয় হউক, তথাপি বহুকল্পদুর্ল্লভ বোধি না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত না হয়।

শ্রীমদ্‌ দাসগোস্বামীর প্রতিজ্ঞা এই যে—

ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশনবসনপত্রাদিভিরহং
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।

ভন তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। তিনি স্বভাবতঃই অতি ধীরে সস্নেহ বাক্যে সকলের সহিত আলাপ করিলেন। রঘুনাথকে নিরতিশয় স্নেহ সহকারে বলিলেন, "রঘু গাছতলে পড়িয়া থাকিও না, তোমার জন্ম এখানে একখানি কুটীরের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, তুমি এখন হইতে সেই কুটীরে থাকিও।"

বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যেত্তু প্রেষ্ঠে সরসিখলু জীবাদি পুরতঃ ॥

স্বনিয়ম দশকে।

কর্ণানন্দে শ্রীল যদুনন্দন দাস ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা :—

এই বৃন্দাবনে মোর সাধন ভজন।
এই স্থানে দেহ ত্যাগ আমার নিয়ম ॥
ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেবা আমার ভক্ষণ।
ব্রজ বৃক্ষপত্র এই আমার বসন ॥
ইহাতেই নির্ব্বাহ মোর দম্ভ দূর করি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা গোবর্দ্ধন গিরি ॥
রাধাপ্রেম-সরোবরে নিকটে নিশ্চয়।
এই স্থানে মরি যেন হেন বাঞ্ছা হয় ॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথের উপাসনা অতি গভীর। তাঁহার নিয়মগুলি প্রকৃতই পাষাণের রেখার স্থায় দুরপনেয়। কঠোর বৈরাগ্য, অটুট অনড় নিয়ম-নিষ্ঠা, অবিচলিত ধ্যানগাম্ভীর্য্য এবং অদ্ভুত বিশ্বনিপ্লাবক শ্রীরাধাপ্রেমের বিশাল প্রবাহ,—ইহাই রঘুনাথের উপাসনার প্রণালী বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। বালুকাভূমিতে জলের প্রবাহ বহিলে তাহাতে অতি সত্বরেই পুলিন-রাশি (চর) পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শিলা-বক্ষ ও শিলাতটে প্রবা-হিত প্রবাহে পুলিনপাতের আশঙ্কা থাকে না। নিয়মের পাষাণে বাধা, রঘুনাথের হৃদয়ে প্রেমভক্তি-প্রবাহের কখনও প্রতিবোধের বা শুষ্কতার আশঙ্কা ছিল না।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদের কৃপা আদেশে শ্রীরাধাকুণ্ডের তট প্রান্তে একখানি নিভৃত নির্জ্জন পর্ণকুটীর শ্রীমদ্ রঘুনাথের শান্তিময় ও প্রেমভক্তিময় ভজন কুটীররূপে বিনির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী এই কুটীরে বসিয়া কথনবা বাহ্য দশায় কথনবা অর্দ্ধ বাহ্য দশায় কথনবা অন্তর্দ্দশায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলার অনুধ্যান ও প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। রঘুনাথের মুক্তাচরিত গ্রন্থ থানি এই কুঞ্জ-সেবার পরিস্ফুট সাক্ষী।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অবস্থানের পর হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের অভিমুখে ভক্তগণের চিত্ত অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীমদ্দাস দাস গোস্বামীর ভজন-সাধন-সন্দর্শন বৈষ্ণবগণের এক মহাপুণ্যজনক কার্য্যে পরিগণিত হইল। শ্রীকুণ্ড ও তত্তটবর্ত্তী সাক্ষাৎ ভজনের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীদাস গোস্বামীর চরণ সন্দর্শন জন্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই শ্রীকুণ্ডতটে গমনাগমন করিতেন।

কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস।

এই সময়ে গৌড় দেশ হইতে একজন বৈষ্ণব যুবক শ্রীভগবৎ প্রেরণায় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েন। ইনি বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত, বিষয়ে বিরক্ত, শ্রীকৃষ্ণ কথায় অনুরক্ত। ইনি অকৃতদার। সংসারাশ্রমে ইহাঁর অর্থ সাধু বৈষ্ণবসেবায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত। শ্রীগৌর নিত্যানন্দে ইহঁার পরম বিশ্বাস। ইহাঁর সহোদরের ও শ্রীগৌরাঙ্গে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দে তেমন বিশ্বাস ছিল না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-ভক্ত মীন-কেতন রামদাসের সহিত ইহাঁর ভ্রাতার বিবাদ হয়। এই জন্য ইনি ভ্রাতাকে ভৎসনা করেন এবং প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সেই রাত্রিতে প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ ইহাঁকে নৈহাটীর নিকট ঝামটপুর গ্রামে স্বপ্নে দর্শনদান (১) করেন এবং শ্রীবৃন্দা

(১) সশিষ্য নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহাশয়কে ঝামটপুরে স্বপ্ন দর্শন দান করেন, ইহা তাঁহার নিজের উক্তি। এই ঘটনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দ্রষ্টব্য। প্রেমবিলাসে এই স্বপ্নদর্শন সাক্ষাৎ দর্শন-

বনে যাইবার আদেশ করেন। এই কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া যুবক শ্রীবৃন্দা-
বনে আগমন করেন এবং শ্রীমদ্ রূপসনাতনের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন '
পরে তথা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথের চরণাভিকে
আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার

রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীনন্দাস গোস্বামীর কথা বলা হই-
তেছে যথা ঃ—

রূপ সনাতন স্থানে কৈল আগমন।
এইরূপ সবাকার হইল মিলন॥
অতি দয়াবান্ হৈল প্রাণতুল্য সম।
ইঁহ ভক্তি করেন তিঁহ করে আলিঙ্গন॥
রাধিকার কুণ্ডে বাস কৈল নিরূপণ।
এহেন বৈরাগী হৈতে প্রিয় কেবা আছে।
কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড়দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥
একদিন ঝামটপুর আছে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাসের আনন্দ অন্তর॥
প্রণাম করিয়া বহু করিলা স্তবন।
আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাহা বৃন্দাবন॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে করিলা গমন।
আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥
কেন হৈল নিত্য হেন করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয়॥
সিদ্ধ ব্যবহার এই অত্যন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয়েন সকল॥

নিজের লিখিত বাক্য এই :—

কি দেখিনু কি শুনিনু করয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হইল বৃন্দাবনে যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥

শিষ্যটী গুরুর মতই বিষয়-বিরক্ত, গুরুর মতই সুপণ্ডিত এবং গুরুর মতই শ্রীগৌর নিত্যানন্দে অনুরক্ত। ইনি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, অমৃতময় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আনন্দামৃতপূর্ণ সারঙ্গরঙ্গদা টীকা ইহাঁরই বিরচিত। ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকারে ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ও বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকটিত রাখিয়াছেন।

এই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অনুক্ষণ শিষ্যরূপে শ্রীদাস গোস্বামীর নিকটে থাকিতেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে :—

কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে।

কবিরাজ স্বকীয় গ্রন্থেও অতি স্পষ্টরূপে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা :—

তাহার সাধন রীতি অতি চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

আদি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজের কি প্রকার গুরু, অন্যত্র তাহার সবিস্তার উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাসরচয়িতার মতে তিনি শ্রীল কবিরাজের ভাগ্য-

ভজনের গুরু। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর একান্ত অনুরক্ত প্রিয়শিষ্য হইলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ করিতেন, আর ভজন শিক্ষা করিতেন এবং নিজেও তাঁহার চরণান্তিকে বসিয়া ভজন করিতেন।

মহাপ্রভুর চরণতলে শ্রীস্বরূপ দামোদর, স্বরূপের পাদমূলে রঘুনাথ, এবং রঘুনাথের পাদমূলে কৃষ্ণদাস—এ দৃশ্য প্রকৃতই প্রেমভক্তিপ্রদ। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যেমন বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলে, তথা হইতে ভূতভাবন ভবানীপতির জটাকলাপে নিপতিত হইয়া অবশেষ ভগীরথ দ্বারা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন, গোলকবিহারিণী ভক্তি-মন্দাকিনীও ঠিক সেইরূপে স্বরূপাদি পার্ষদ-পরম্পরায় জনসমাজে প্রবাহিত হইয়া জীবের প্রতপ্ত মরু-হৃদয় পরিসিক্ত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীমদ্ রঘুনাথের পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীগৌরলীলা-মন্দাকিনীর প্রেমধারায় স্বয়ং অভিসিক্ত হইলেন এবং ভক্তগণকেও সেই লীলাসুধা উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। যথা :—

চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিলে তাহা এই বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।

কবিরাজ গোস্বামী ও দাস ব্রজবাসী নামক অপর একটি সেবা পরায়ণ শিষ্য সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ রঘুনাথের নিকটে থাকিতেন

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীবৃন্দাবনে অসহ্য বিরহ।

রঘুনাথ শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপের কৃপা লাভ করিয়া শ্রীস্বরূপের বিরহ জ্বালার অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ ও শীর্ণ হইয়াছিলেন, এমন কি শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না, নিজে তাঁহার সমস্ত সেবা করিতেন। এই অবস্থাতেও স্নেহময় শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকে দর্শন দিতেন, মধুর স্নেহবাক্যে আহ্লাদিত করিতেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীচরণ-সুধাস্বাদে কৃতার্থ হইতেন, তাঁহার কৃপা স্নেহে নিজকে পরম সৌভাগ্যশীল বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু বিরহী রঘুনাথের জীবন বিরহ জ্বালার এক আগ্নেয়গিরি। এক বিরহ শিখার উদ্গম নিবৃত্ত হইতে না হইতেই অপর বিরহ তাহার হৃদয় অধিকার করিত। তাহার হৃদয় বিপ্রলম্ভ রসের অফুরন্ত উৎস। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার প্রতি অতি স্নেহশীল,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রীপাদ সনাতন,—তাঁহার হৃদয়ে বিরহের অনল জ্বালিয়া দিয়া তিরোহিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে তদনুজ শ্রীরূপ গোস্বামীও জ্যেষ্ঠের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ করিলেন। এই ঘটনার পরে রঘুনাথ ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—

উদ্যাম নর্ম্মরসকেলি বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধামুকুন্দ যুগলং ললিতা বিশাখে।
গৌরাঙ্গচন্দ্র মিহরূপযুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতিসহে স্ফুট রে ললাট।

অর্থাৎ হায়, পরিহাসরসক্রীড়াশীল রাধাকৃষ্ণ কোথায়, নর্ম্মসখী ললিত বিশাখা কে যে, আমার পরম দয়াল গৌরাঙ্গসুন্দর কোথায়, হায় হায়,

আমার সেবাশ্রয় সেই রূপসনাতনই বা কোথায়, আমার ললাটে কি এত দুঃখ ছিল, আর কত যাতনাই সহ্য করিব। পোড়াকপাল আমার এখনও বিদীর্ণ হইল না!"

শ্রীবৃন্দারণ্য রঘুনাথের নিকট প্রকৃতই অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল, দেহ-বন্ধ শিথিল হইল, সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইল, তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইল। প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন :—

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজাগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥

হায়, আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপ-বিহনে মহাগোষ্ঠ শূন্য-শূন্য বোধ হইতেছেন, গোবর্দ্ধন যেন অজাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, এমন কি স্বয়ং শ্রীকুণ্ডও ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।" ফলতঃ প্রিয়জনের বিরহে অতি সম্ভোগ্য প্রিয়বস্তুসমূহ ও বিষবৎ বোধ হয়, কেননা এই সকল পদার্থ-সন্দর্শনে শোকের আগুণ অধিকতর জ্বলিয়া উঠে। তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

অপূর্ব্ব প্রেমাব্ধেঃ পরিমল পয়ঃফেণ নিবহৈঃ
সদা যো জীবাতু র্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাব বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যামি শরণম্॥

অর্থাৎ "শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপার কথা মনে পড়িয়া আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। তিনি প্রেমামৃত সাগরের সুগন্ধি ফেণরাশিতে সর্ব্বদা আমাকে পরিসিক্ত রাখিতেন, হায় আমার জীবনোপায়স্বরূপ সেই শ্রীরূপ এখন কোথায়? আমি সততই বিপদরূপ দাবানলে দগ্ধ। এখন আমি আর কাহার কাছে দাড়াইব, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব?" তিনি আবার বলিতেছেন "আমার প্রাণ এখনও এ দেহে বহিয়াছে কেন? এ দেহ পর্ব্বত হইতে পড়িয়া বিনষ্ট না হইতেছে কেন? তাতেই বা কি হইবে? বিধাতা যে এ দেহকে বজ্রসারে নির্ম্মিত করিয়াছেন!

অথবা আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি মরিলে এ দুঃখভার আর কে বহন করিবে? যথা:—

ন পততি যদি দেহ স্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈঃ যদ্‌বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতু গাঢ় তর্কেন দৃষ্টঃ
প্রকট রুদনভারং কো বহত্বন্যথা বা॥

প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে।

ফলতঃ শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী বিবিধ প্রকারে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন ভজন সাধনের উপদেশ প্রদান করিতেন, গ্রন্থ লিখিয়া তাহা শ্রীরঘুনন্দনকে পাঠ করিতে দিতেন, তাহার মতামত গ্রহণ করিতেন, কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি জ্যেষ্ঠের যেরূপ স্নেহ বাৎসল্য দৃষ্ট হয়, এই স্নেহ বাৎসল্যের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। শ্রীমদ্ রঘুনাথ নিজেও বলিয়াছিলেন এই স্নেহ জগতে অতুলনীয়। এ স্থলে একটি সামান্য উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রসঙ্গটী ভক্তি-রত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গেও বর্ণিত আছে।

শ্রীরূপ, ললিতমাধব নাটক লিখিয়া শ্রীমদ রঘুনাথকে সেই নাটক পাঠ করিতে দেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রলম্ভ রসের প্রকট মুর্ত্তি। ললিতামাধব নাটকও বিপ্রলম্ভ রসের বিশুদ্ধ আধার। রঘুনাথ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই নয়নজলে তাঁহার বক্ষ পরিপূত হইয়া যাইত, কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, রঘুনাথের হৃদয় শোকের ভারে অবনত হইয়া পড়িত, তিনি গ্রন্থখানিকে বুকে করিয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন, কখন বা উহা হইতে দূরে সরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন, কখনবা উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত ধাবিত হইতেন, কখনবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।* গ্রন্থ

গ্রন্থ পড়ি রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
কভু দূরে রহে গ্রন্থ পরিহরি।
কভু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি॥

পাঠের ফলে শ্রীরঘুনাথের নানা দশার আবির্ভাব হইত? ইহা দেখিয়া বৈষ্ণব মাত্রই নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী দেখিলেন,—রঘুনাথের এই রোগের কারণ,—ললিতমাধব নাটক। তিনি অচিরেই ইহার ঔষধ আবিস্কার করিলেন— সেই ঔষধ দানকেলী কৌমুদী গ্রন্থ। শ্রীরূপ এই গ্রন্থ হাতে করিয়া রঘুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রঘু ভাই, এই নূতন গ্রন্থখানি একবার আস্বাদন কর, ললিতমাধব আমাকে দাও, উহাতে একটু সংশোধন করিতে হইবে।" ললিতমাধব গ্রন্থ পাঠ করা যদিও রঘুর পক্ষে অসম্ভব, যদিও এই গ্রন্থ তাঁহার নিকট "বিষামৃত একত্র মিলন" বলিয়া প্রতিভাত হইত, যদিও "তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায়" পরিত্যাগ ও আস্বাদন উভয়টী অসম্ভব অথচ উভয়ই অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু শ্রীরূপ যখন সংশোধন করার জন্য গ্রন্থখানি চাহিতেছেন, তিনি অত্যা ললিতমাধব শ্রীরূপের হস্তে দিয়া শ্রীদানকেলীকৌমুদী গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। এই গ্রন্থ পাঠে ললিতমাধব নাটক পাঠের ক্লেশ দূরীভূত হইল, তিনি মহা আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত।
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মূর্চ্ছিত॥

ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ।

এই ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর কি ভাব উপস্থিত হইত, প্রেমবিলাসে তাহারও বর্ণনা আছে, যথা:—

একদিন শ্রীজীব গ্রন্থ করেন নিরীক্ষণ।
ললিত মাধব গ্রন্থে যে সব বচন।
কৃষ্ণের মথুরা গমন অতি গাঢ়তর।
সে বিচ্ছেদে প্রাণ ত্যজে রাধা পরিকর।
গোসাঞী লিখিল জীব করেন ভাবন।
মূর্চ্ছিত হইয়া জীব পড়িলা তখন॥

দানকেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর ।
সুখ সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥

শ্রীমদ্ রঘুনাথের শোকাপনোদনের জন্যই দয়াময় শ্রীরূপ, দানকেলী-কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী সংসারত্যাগী, উদাসী। যিনি অবলীলাক্রমে পিতামাতার স্নেহ ও প্রণয়িণীর কোমল প্রণয় পরিত্যাগ করিয়াই মহাসুখ

শ্রীরূপের এই গ্রন্থ-বিরচনের হেতু তিনি এই গ্রন্থেও সূত্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্‌যথাঃ—

গ্রথিতা সুমনঃ-সুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকাস্রগিয়ং।
তস্য মম প্রিয়সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলঙ্করুতাম্ ॥

শ্রীল টীকাকার মহাশয় টীকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"তস্যপ্রিয়সুহৃদঃ রাধাকুণ্ডনিবাসিনঃ শ্রীরঘুনাথদাসস্যেত্যর্থঃ" অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডতটনিবাসী আমার প্রিয়সুহৃদ শ্রীরঘুনাথ দাসের নিদেশে, এই জনসুখদা ভাণিকা-মালা গ্রথিতা হইল, এই গ্রন্থ ক্ষণতরেও আমার সেই প্রিয়সুহৃদের কুণ্ডতটীকে সমলঙ্কৃত করুক।"

এই গ্রন্থের উপসংহারে যে আশীর্ব্বচন পদ্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায়, শ্রীমদ্দাস গোস্বামীই সেই আশীর্ব্বাদের লক্ষ্য। তদ্‌যথা ঃ—

রাধাকুণ্ডতটীকুটীরবসতি স্ত্যক্তান্যকর্ম্মা জনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়ো যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্যসমৃদ্ধিদোহদপদক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতে
তর্ষাখ্যতরুবস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয় স্ত্বয়া।

অর্থাৎ হে মাধব তুমি বৃন্দারণ্যবাসীদিগের সমৃদ্ধি প্রদানে ক্রীড়াকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাক, আমার প্রার্থনা এই—ঐ যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী রাধা-কুণ্ডতটান্তকুটীরাশ্রয়ী শ্রীমদ্দাস রঘুনাথ কেবল তোমাদের সেবার জন্যই দিনরজনী উৎকণ্ঠিত হইতেছে, তুমি উঁহার মনোরথরূপ-তরুকে সত্বরে ফলবান্ কর।"

লাভ করিলেন, সেই বিষয়-বিরাগী উদাসীর হৃদয়ে বিশুদ্ধ স্নেহ-মমতার কোমল বৃত্তি কি প্রকারে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, পারমার্থিক আত্মীয়-গণের বিয়োগে উচ্ছ্বসিত শোক-প্রবাহই তাহার অকাট্য পরিচয়। ভক্তি রত্নাকর-কার লিখিয়াছেন ঃ—

কোথা শ্রীস্বরূপ রূপসনাতন বলি।
ভাসয়ে নেত্রজলে বিলুণ্ঠয়ে ধূলি॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥

শ্রীল রাধাবল্লভ দাস পদে লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীরূপ সনাতন, যবে হইল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন
বৃথা আঁখি কাহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহ রাখি,"
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥

এতদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, হৃদয়ের বিশুদ্ধ কোমল বৃত্তির উৎপাটন,—বৈষ্ণবের বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে, প্রত্যুত উহার পুষ্টিসাধনই বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ।

নীলাচলে গমনের পর হইতেই রঘুনাথ রসনা-জয় করিয়াছিলেন, ক্ষুধা জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার আহার ছিল না বলিলেই হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহের পর হইতেই তিনি অন্ন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই তিন পল মাঠা ও ফল ভক্ষণ করিয়া দেহ ধারণ করিতেন, শ্রীসনাতন গোস্বামীর বিয়োগে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, কেবল একটু জলপান করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরূপের বিচ্ছেদে জল-টুকুও ত্যাগ করিলেন। §

---

§ রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
সুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফলগব্য করিল আহার॥

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের পরে দুইটী নবীন শ্রীমূর্ত্তিতে মহাপ্রভুর প্রেমশক্তির প্রাকট্য পরিলক্ষিত হয়। একটীর নাম শ্রীনিবাস,—অপরটীর নাম শ্রীনরোত্তম। শ্রীল নরোত্তম স্বীয় সাধন ভজন বলে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় ও পূজিত হইয়াছিলেন। এই উভয়েরই শিক্ষাদীক্ষা স্থল—শ্রীবৃন্দাবন। ইঁহারা উভয়েই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শুভ সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া।
শ্রীদাস গোস্বামীর আগে গেলা দোঁহা লৈয়া॥

এই সময়ে শ্রীরাঘব পণ্ডিতও ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার মুখে ইঁহাদের কথা শুনিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ আহ্লাদিত হইলেন। শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চরণে প্রণত হইলেন যথা :—

শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামি চরণে॥

সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥

এইরূপে কি প্রকারে দেহ রক্ষা পায়, বর্ত্তমান Physiology তাহা বুঝাতে অসমর্থ হইলেও এরূপ ঘটনায় অবিশ্বাসের হেতু নাই। পঞ্জাবের হরিদাস সাধু নয়মাস কাল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকিয়াও সজীব ছিলেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। অধুনা ভারতীয় যোগতত্ত্বের দিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি পড়িতেছে। Psycho-Physiology নামধেয় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সকল রহস্য-ব্যাখ্যার পথ ক্রমেই প্রসস্ততর হইবে, এখন এরূপ আশা করা যায়।

ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের এক বিশেষত্ব। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী মূর্ত্তিমতী শক্তি। বর্ণ-বিচারের সহিত এই শ্রীমূর্ত্তির কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? এই ভক্তিময় বিগ্রহ সর্ব্ব বর্ণেরই উপাস্য, তাঁহার শ্রীচরণ সর্ব্ব বর্ণেরই শিরোভূষণ। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর দেহ তখন শুষ্ক ও নিরতিশয় দুর্ব্বল তথাপি তিনি ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন করার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন, অতি ধীরে ধীরে শ্রীনিবাসকে যেন কি কথা বলিলেন,—হয়ত শ্রীমদ্দাস গোস্বামী বলিয়াছিলেন "বাবা, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান তাহাতে অতি ভক্ত, বিশেষতঃ তুমি মহাপ্রভুর প্রেম-শক্তি,—আমার নিকট ওরূপ করিয়া আমাকে অপরাধী করিলে কেন?" হয়তো তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার মস্তক সর্ব্বত্রই অবনত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপস্থিত হওয়া মাত্রই আবার ইহারা তাঁহার নিকটেও তেমনি প্রণত হইতে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া শ্রীনিবাসের পাদমূলে অবনত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীদাস ব্রজবাসী ও একজন পরম বৈষ্ণব। তিনি সকলের সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেমবিলাস পাঠে জানা যায় শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই মিলনের অনেক পূর্ব্বেই ঠাকুর মহাশয়ের গুণের কথা শুনিয়াছিলেন যথা :—

শ্রীদাস গোস্বামী একদিন কুণ্ডতীরে।
ঠাকুর মহাশয়ের নাম শুনিল নির্ভরে॥
শ্রীদাস গোস্বামী কহে শুন কৃষ্ণদাস।
নরোত্তম দাস হৈলা গুণের প্রকাশ॥
যে করিলা গুরুসেবা যে ভজন রীতি।
তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সংপ্রতি॥
শ্রীগুরুর কৃপা সাধন কৈলে এই হয়।
শ্রীরূপের গ্রন্থ বাক্যে আছয়ে নিশ্চয়॥

আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের সময়েও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার নিক

অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীমৎ রূপসনাতনের বিরহে অতীব ব্যাকুল থাকিতেন। দেহ অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, দুই চারি দিন পরে তিনি কখন কিঞ্চিৎ প্রসাদ মুখে দিতেন, শরীর এমন শীর্ণ হইয়াছিল যেন বাতাসেই হেলিয়া পড়িত। এই অবস্থাতেও এক মুহূর্ত্তও তাঁহার ভজন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি প্রভু দত্ত শিলামালার যথারীতি সেবা করিতেন, আত্মহারা হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতেন, দিবারাত্রি কি প্রকারে আসিত ও যাইত সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না, প্রেমে অধীর হইয়া কাঁদিতেন, আর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলারসে নিমগ্ন থাকিতেন লীলার অনুধ্যান করিতেন, অন্তর্দ্দশায় সাক্ষাৎ শ্রীলী·াসন্দর্শন করিতেন এবং বাহ্যদশায় লীলা গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন।

শ্রীনিবাস শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চরণে পড়িয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। দুর্ব্বল দেহ,—দাস গোস্বামী বহু কষ্টে অথচ ব্যস্তভাবে শ্রীনিবাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া উভয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিদায়ের অনুমতি দিবার সময়ে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর নেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। যথা :—

সর্ব্ব মতে সারধান করি শ্রীনিবাসে।
আলিঙ্গন করি দুই নেত্র জলে ভাসে॥

এই দুই প্রেমশক্তির আরও একটী সহচর জুটিয়াছিলেন,—তাঁহার নাম শ্যামানন্দ। ইঁনি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহৃদয় চৈতন্যের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। ভক্তিগ্রন্থাস্বাদনের জন্য, শ্রীব্রজরজে ও শ্রীপাদ গোস্বমিগণের পদরজে পবিত্র হইবার জন্য ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডতীরে ইঁহার সহিত দাস ব্রজবাসীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীচরণ সন্দর্শন করান। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী একদিন ইঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া পরদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট প্রেরণ করেন। যথা :—

সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা লোক সঙ্গে দিয়া॥ ভক্তিরত্নাকর।

প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর সহিত শ্রীল শ্যামানন্দের মিলন নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে। শ্যামানন্দ কুটীরবাসী ধ্যানস্থ শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কুটীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন :—

সাধন করয়ে কারে কিছু নাহি কহে।
অশ্রু পড়ে দুই চক্ষে, তাকাইয়া রহে॥
ক্ষণেক পরেতে গোসাঞী কহিল বচন।
কোথা হৈতে বৈষ্ণবের হৈল আগমন॥

শ্যামানন্দ তখন দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "দক্ষিণ দেশে আমার জন্ম, প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনার্থ আসিয়াছি। আমার নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। শ্রীল হৃদয়চৈতন্য দাস মহোদয় আমার গুরুদেব। আমারপরম গুরু, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরীদাস। যথা প্রেমবিলাসে :—

কি নাম তোমার, কার চরণ আশ্রয়?
মোর নাম দুখী কৃষ্ণদাস নিবেদয়॥
মোর প্রভু হৃদয় চৈতন্যদাস মহাশয়।
মো ছার জীবের সেই চরণ আশ্রয়॥
পরম গুরু গৌরীদাস পণ্ডিত মহাশয়।
শুনিয়া গোসাঞীর বাড়ে আনন্দ হৃদয়॥

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী তাঁহার পরিচয় পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঐ যে আর একটী কুঞ্জ দেখিতেছ, ওখানে গিয়া দেখ, শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভজন করিতেছেন।" শ্যামানন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চরণ দর্শন করিতে কুঞ্জান্তরে গমন করিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে ভজন সাধন করিতেছেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, কবিরাজের বাহ্যজ্ঞান নাই, নয়ন নিমীলিত। পরে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, শ্যামানন্দ দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। কৃষ্ণদাস অতি বৃদ্ধ. দেহখানি শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ন্যায় বাতাসে হেলে :—

"অতি বৃদ্ধ জরাদেহ সূক্ষ্ম বাক্য অতি।"

প্রেমবিলাস।

কৃষ্ণদাস দেখিলেন একটী ভক্ত যুবক মাথা কুটিয়া কোটী কোটী প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার মনে কষ্ট হইল, জিজ্ঞাসিলেন, "বাপু তুমি কে, ওরূপ করিয়া আমায় ব্যথা দিতেছ কেন? শ্যামানন্দ পূর্ব্ববৎ সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন।

এই শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের পদানুসরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং ইঁহাদের সঙ্গেই গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। ইনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে ব্রজরসে উৎকল ভূমি পরিপ্লুত করিয়াছিলেন। এখনও উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরে বহুল ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও অপরাপর জাতীয় লোকেরা এই প্রেমিকভক্ত শ্রীল শ্যামানন্দের পরিবার রূপে পরিচিত।

মাতৃ-দর্শন।

তাপত্রয়-নিবারিণী প্রেমভক্তিরত্ন-প্রদায়িনী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রিয়তমা শ্রীশ্রীজাহ্নবেশ্বরীও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের বর্ণনা এইরূপ :—

প্রাতঃকালে ঠাকুরাণী যাই কুণ্ডতীরে।
দর্শন করিয়া চিত্ত কৈলা কিছু স্থিরে।
রঘুনাথ দাস গোস্বামী আছিলা বসিয়া।
সেই স্থানে ঠাকুরাণী উত্তরিলা গিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈল ঠাকুরাণীকে করি অভ্যর্থন।

ঠাকুরাণী বলিলেন :—

তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥

শ্রীকুণ্ড হইতে বিদায়ের কালে শ্রীশ্রীজাহ্নবেশ্বরী রঘুনাথের হাতে ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। রঘুনাথ বলিলেন "মা আমাকে চিরদিন নিজের ভৃত্য বলিয়া মনে রাখিবেন।" রঘুনাথের তখন বুঝি পাণিহাটীর কথা মনে পড়িল, প্রভু নিত্যানন্দের অপার দয়ার কথা মনে পড়িল।

তিনি কাঁদিয়া বলিলেন আমি নিতান্ত অভাজন, বিষয়ীর ঘরে আমার জন্ম, আমি ভজন সাধনবিহীন, আমার এমন কি গুণ আছে যে শ্রীগৌরাঙ্গ আমায় কৃপা করিবেন। একদিনও তাঁহার সেবা করিলাম না। তাঁহার চরণ-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছি, অথচ এই প্রার্থনায় আমার লজ্জা হইতেছে না যথা :—

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাসি লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য পদে দিবেন অভয়॥
একদিন না করিনু চৈতন্য সেবন।
তথাপি ওপদ মাগে এ দীন অধম॥

ঠাকুরাণী বলিলেন, "রঘু এগুলি তোমার দৈন্য বাক্য, ইহাতে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল। আমি তো ভজন সাধনের কিছুই জানি না। আবার যেন তোমাদিগকে দেখিতে পাই। তোমরা ভক্ত, তোমরাই আমাকে কৃপা করিও।" ঈশ্বরী শ্রীকুণ্ড প্রণাম করিলেন, কুণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া প্রার্থনা করিলেন, "শ্রীকুণ্ড তোমার তটপ্রান্তে যেন এ দীনের একটু স্থান হয়।"

স্নেহময়ী জননী পুত্রকে রাখিয়া দূরে যাইবার সময়ে যেমন রোদন করেন, ঈশ্বরী রঘুনাথের হাত ধরিয়া তেমনি কাঁদিলেন। রঘুনাথও সরলস্বভাব শিশুর ন্যায় মায়ের বিদায়কালে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। এই-রূপে শ্রীজাহ্নবেশ্বরী পুত্রবৎ রঘুনাথের নিকট হইতে বিদায় লইলেন যথা—

এই মত সেই স্থানে বিদায় হইয়া।
নিজে কান্দি যান রঘুনাথে কান্দাইয়া॥ প্রেমবিলাস।

ভক্তিরত্নাকরেও এইরূপ লিখিত আছে। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীঈশ্বরীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার চরণে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই, তিনি সততই বিরহে বিহ্বল। কিন্তু তথাপি কষ্টেশ্রষ্টে নিয়ম নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীঈশ্বরীর চরণে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, শ্রীঈশ্বরী শ্রীকুণ্ডতীরে আসিয়া দর্শন দিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দাঁড়াইতে পারেন না, তথাপি :—

শুনি কি অদ্ভুত প্রেম ব্যাপিল হৃদয়।
আগুসারি চলে অশ্রুযুক্ত নেত্রদ্বয়॥
শ্রীঈশ্বরী দেখে দাস গোস্বামী গমন।
অতিশয় ক্ষীণতনু তেজে সূর্য্য সম॥

বিদায়কালে উভয়েই উভয়ের জন্য কাঁদিয়া অধীর হইলেন। মাতার বিদায়ে একদিকে পুত্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন, পুত্রকে রাখিয়া মাতা অন্যত্র যাইতেছেন তাঁহার অন্তরও ফাটিয়া যাইতে লাগিল যথা :—

কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে।

উদাসী বিষয়বিরক্ত রঘুনাথ! তুমি গর্ভধারিণীর স্নেহবন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করিয়া আসিলে তখন তোমার নয়নে একবিন্দু অশ্রুজল পরিলক্ষিত হয় নাই! বৃদ্ধ উদাসী বৈষ্ণব, আজ এই মাতার জন্য তোমার নয়নধারা বহিতেছে কেন? আজ তোমার প্রাণ এত ব্যাকুল কেন?

প্রকৃত কথা এই যে বৈষ্ণবধর্ম্মে সংসারত্যাগ নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মে আসক্তি ভিন্ন বৈরাগ্য নাই। বৈষ্ণব, মায়াময়বিষয়-সংসার ত্যাগ করিয়া পারমার্থিক সংসার পাতিয়া লয়েন। এই সংসারে পুনর্ব্বার তাঁহার আর এক শ্রেণীর মাতাপিতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত সম্বন্ধ সংগঠিত হয়। এই আত্মীয়বর্গের সহিত বিশুদ্ধ পারমার্থিক সম্বন্ধ ব্যতীত কোনও স্বার্থ সম্বন্ধ ঘটে না। সাধনার পথে বৈষ্ণবের এই এক নূতন সংসার ঘটে। ইহার পর সিদ্ধাবস্থাতেও বৈষ্ণবের সংসার দূরীকৃত হয় না। তখন সখীবৃন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে লইয়াই বৈষ্ণবের এক অভিনব সচ্চিদানন্দময় সুন্দর সংসার আবির্ভূত হয়। এ সংসারেও বৈষ্ণবের যথেষ্ট সুখ দুঃখ আছে, এখানেও মিলনের সুখ, বিরহের যাতনা, বৈষ্ণবের নিত্য সম্ভোগ্য। অশ্রুজল বৈষ্ণবের নিত্য সহচর,—আনন্দে অশ্রু—বিষাদেও অশ্রু—মিলনে অশ্রু—বিরহেও অশ্রু। প্রেমে ঢল ঢল সজলনয়ন মহাপ্রভুই তাহার সাক্ষী। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর মুখকমলও অনুক্ষণই শিশিরসিক্ত পরিম্লদিত কমলের ন্যায় অশ্রুজলে পরিসিক্ত থাকিত। তিনি অনেক সময়েই ব্রজ-সংসারের সুখ-দুঃখময় প্রেমের ভাবে নিবিষ্ট থাকিতেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনে হাসিতেন এবং বিয়োগে কাঁদিতেন।

সাধন-ভজন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর নিয়মনিষ্ঠা, ভজন ও সাধন রীতি প্রকৃতই বিস্ময়-জনক। তিনি অন্ন জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতকার বলেন ঃ—

অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥

পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ বলেন ঃ—

রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলে রাখে প্রাণ।

তাঁহার শরীর অতি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, যেন বাতাসে হেলিয়া পড়িত, তথাপি তাঁহার ভজন-নিয়মের অন্যথা হইত না।

অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
কবয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥
যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয় ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই অবস্থায় মানস উপচারেই প্রভুদত্ত শিলা ও গুঞ্জামালার সেবা করিতেন, মানসোপচারেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ দিতেন এবং সেই মানস-প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এ সম্বন্ধে ভক্তিরত্না করে এক অদ্ভুত প্রস্তাব লিখিত আছে। প্রস্তাবটী এইরূপ ঃ—এক দিবস শ্রীদাস গোস্বামীর অজীর্ণবৎ পেট ভার বোধ হয়। বল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ইহা শুনিয়া দুই জন চিকিৎসক আনাইলেন। তাঁহারা নাড়ী দেখিয়াই রোগের কারণ ঠিক করিয়া বলিলেন, "দুগ্ধান্ন ভোজনই এই অজীর্ণের কারণ।" চিকিৎসকদের বিদ্যা দেখিয়া বিঠ্ঠলনাথ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আপনাদের ত বেশ নাড়ীজ্ঞান দেখিতেছি। ইনি আদৌ অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা রোগের যে কারণ বলিতেছেন উহা অসম্ভব।" রঘুনাথ উহাঁর কথায়

বাধা দিয়া বলিলেন, "বিঠ্‌ঠল, তুমি বিস্মিত হইও না, কবিরাজ মহাশয়দ্বয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সত্য। আমি গত কল্য মানসে দুগ্ধান্ন নিবেদন করিয়া মানসে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া চিকিৎসকদ্বয় নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্ড তটবর্ত্তী কুটীরে অনেক সময়েই অনন্যমনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে, নামজপে ও অন্তর্দ্দশায় সাক্ষাৎ শ্রীলীলা-দর্শনে সময় অতিবাহিত করিতেন।

অপিচ শ্রীশ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, শ্রীমদ্দাস গোস্বামী সে সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ তখন এত দুর্ব্বল ও জীর্ণ যে তিনি নিজে শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারিলেন না, সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন "মা যেন শ্রীকুণ্ডতীরে এ দীনজনকে দয়া করিয়া চরণ দর্শন দানে কৃতার্থ করেন।" তখনও রঘুনাথের ভজনের কঠোর রীতির বিন্দুমাত্রও ভঙ্গ হয় নাই, যথা:—

শ্রীরাধিকা কুণ্ডবাসী শ্রীদাস গোসাঞী।
শুনি হর্ষ হৈলা চলিবার সাধ্য নাই॥
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে সদা অস্থির হৃদয়।
অন্নাদি বিহনে দেহ ক্ষীণ অতিশয়॥
নিয়ম নির্ব্বাহ বৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে॥

১১শ তরঙ্গ, ভক্তিরত্নাকর।

তাঁহার অনুষ্ঠিত নিয়ম সমূহের মধ্যে এ স্থলে কতিপয় নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে, শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন:—

তিনসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান॥

এখানে দুইটী নিয়মের উল্লেখ হইয়াছে।

১। তিনসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
২। ব্রজবাসী বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সংরক্ষণ।

শ্রীকুণ্ড সর্ব্বতীর্থময় এবং সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ। ইহাতে স্নানের ফল শাস্ত্রে বহু কীর্ত্তিত আছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্বরচিত শ্রীকুণ্ডাষ্টকেও ইহার অশেষ মাধুর্য্য বর্ণিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-সংরক্ষণ বৈষ্ণবের একান্ত কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব অপরাধ ঘটিলে ভক্তি-মার্গ হইতে পতিত হইতে হয়। (১)

পদকর্ত্তা শ্রীল রাধাবল্লভও লিখিয়াছেন :—

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান কবি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥

তিনি ভক্তির সাধনায় প্রতিদিন সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর সময় অতিবাহিত করিতেন। ৬০ দণ্ড দিবসকালের মধ্যে জীবনযাত্রা-ব্যাপারে ৪ দণ্ড মাত্র কাল অতিবাহিত হইত। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আচরণ।
অপ রাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥

বৈষ্ণব অপরাধ কি, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন :—

হন্তি নিন্দন্তি বিদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে দর্শনে হর্ষং নো যাতি পতনানি ষট্॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব তাড়ন করা, তাঁহার নিন্দা করা, দ্বেষ করা, আলিঙ্গনাদি দ্বারা অভিনন্দন না করা, অপমান করা, এবং দর্শনে হর্ষিত না হওয়া বৈষ্ণব অপরাধের মধ্যে গণ্য।

পদকর্ত্তাও লিখিয়াছেন :—

ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্র দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণগানে,
স্মরণেতে সদায় গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥

শ্রীভক্তমালে লিখিত আছে :—

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে করিলেন বাস।
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার ক্ষণে নহে সুস্থ চিত॥
হা হা বৃন্দাবনেশ্বরি, হা ব্রজনাগর।
দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্য স্ফুর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সাধনের রীতির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।

যিনি ৬০ দণ্ড দিবারাত্রির মধ্যে ৫৬ দণ্ড কাল একনিষ্ঠ ভাবে ভক্তি সাধনে নিরত থাকিতেন, তিনি জগতের প্রত্যেক দেশের সাধকদিগেরই যে গুরুস্থানীয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রকৃতই ভজন সাধনের মহামহা অবতার। জগতের ইতিহাসে এইরূপ ভজন-বিগ্রহের ন্যায় আর একটীরও পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার আরও বলিতেছেন :—

সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম। (১)
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরিণাম॥

---

(১) শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রত্যেক শত অষ্টোত্তর বার জপের পরে

৭ পয়ারে তিনটী নিয়মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ঃ—

১। লক্ষ নাম গ্রহণ করা।

২। নাম গ্রহণে সহস্রবার প্রণাম করা।

এক একবার প্রণাম করিতেন, সুতরাং লক্ষ জপে তিনি সহস্রবার প্রণত হইতেন। তাহার ভজনের মধ্যে জপের কথাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীল হরিদাস নামজপ সম্পত্তির মহাসম্রাট্। তিনি তিন লক্ষবার নাম জপ করিতেন। রঘুনাথ অতি শৈশবে তাঁহার চরণধূলি পাইয়াছিলেন। ইনিও লক্ষ নাম জপ করিতেন। প্রায় দিবানিশিই জপে নিমগ্ন থাকিতেন, যথা ভক্তিরত্নাকরে ঃ—

দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নহে অশ্রুধারা দুনয়নে॥

ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে এইরূপ ভাবেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবার যখন শ্রীশ্রীজাহ্নবীবেশ্বরী কুণ্ডতীরে গমন করেন, তখনও তিনি নাম জপেই বিভোর ছিলেন যথা

দাস গোস্বামী সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে।
করেন শ্রীনাম গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥

নামই কলির জীবের একমাত্র মহাসাধন। প্রভুর উপদেশ ঃ—

হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রভুর শ্রীমুখের দৈন্যসূচক জীবাশঙ্কার শ্লোকেই নামমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বহু বচনের উল্লেখ না করিয়া শ্রীমুখোদ্গীর্ণ পদ্যটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা ঃ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ॥

৩। দুই সহস্র বৈষ্ণবের প্রণাম করা।*

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভজন-নিয়মের মধ্যে শ্রীনাম জপ, এক প্রহর-

শ্রীচরিতামৃতের পয়ার ঃ—

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপ লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

এই বলিয়া প্রভু তৃণাদপি শ্লোক পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

* দুই সহস্র বৈষ্ণবের প্রণাম করার প্রকৃত অর্থ এই যে তিনি দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন। অর্থাৎ দৃষ্টশ্রুত বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে করিয়া তিনি দুই সহস্র বৈষ্ণবের স্মরণ করিতেন ও উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে ঃ—

শ্রীদাস গোস্বামীর দেখ ভজনের রীতি।
দৃষ্টশ্রুত বৈষ্ণবেরে করেন নতি স্তুতি॥

শ্রীরাধাবল্লভ দাস শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সূচকে আরও স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যথা ঃ—

শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তার গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত নানা স্থলে, দৃষ্টশ্রুত বৈষ্ণব দলে,
সবারে করয়ে পরণাম॥

ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে—

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ভুবি।
উভয়ো রন্তরং বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥

কাল শ্রীগৌর-চরিত্র-চিন্তন ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসীসেবা,—অতীব অন্তরঙ্গ ব্যাপার। যদিও এখানে তিনটী বিশেষ বিশেষ ভজনের নাম উল্লিখিত হইল, কার্য্যতঃ ইহাঁরা এক,—একই তত্ত্বে অনুস্যূত। নাম ও নামী অভিন্ন ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ শ্রদ্ধা করি।
নামের মাঝারে আছে আপনি শ্রীহরি॥

ইহা অতি সত্য কথা। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একই পদার্থ। হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম মূর্ত্তি শ্রীরাধা। শক্তি ও শক্তিমান্ এক। নিজানন্দানুভূতিসাধনরূপা সাক্ষাৎ স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী এবং শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে একাত্ম হইলেও লীলারস আস্বাদানর জন্য শ্রীবৃন্দাবনে দুই শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত। অধুনা কলিযুগে সেই দুই মূর্ত্তি আবার এক হইয়া প্রকটিত হইলেন। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নীলাচলে শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট এই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন।* শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বতঃ বিশুদ্ধ এক পদার্থ। তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুরূপে স্বভক্তগণকে স্বীয় ভজন মুদ্রা উপদেশ প্রদান করেন। তিনি ব্রজরসের ভজনশিক্ষা না দিলে লোকে তাঁহার ব্রজতত্ত্ব, ব্রজরস বুঝিতে পারিত না। তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রধানতম পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রবোধা

* শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশোবা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্য সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু॥
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতে হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মনবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম॥

নন্দ সরস্বতী, ভট্টাচার্য্য শ্রীল সার্ব্বভৌম ও শ্রীপাদ গোস্বামিগণ সকলেই একবাক্যে এই নিগূঢ় কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের সকল উক্তিতেই পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসতত্ত্ব বুঝিতে হইলে শ্রীগৌর-চরিত ধ্যান সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। তাই শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এক প্রহরকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও শ্রীগৌরচরিত্র পরিচিন্তন করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যানে বিভোর হইতেন, তাহার পরেই শ্রীব্রজরসের আবির্ভাব হইত, ব্রজলীলার পূর্ণ স্ফুর্ত্তি হইত। পরবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই লিখিয়াছেন ঃ—

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতিরস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভজন অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

তৎকালে সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের এইরূপ ভজন পরিপাটী ছিল। শ্রীল নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনেও এইরূপ ভজনপ্রণালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিজেও এইরূপ ভজন করিতেন। তাঁহার

শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্দাস গোস্বামী সম্বন্ধেও তিনি এই কথাই লিখিয়াছেন, যথা :—

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণের অনুধ্যান না করিলে ব্রজরসের ভজনাধিকার জন্মে না, নিত্যলীলার স্ফুর্ত্তি হয় না। গৌড়ীয় বিশুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব সাধক-গণের অনেকেই এখন এই প্রণালীতেই ভজন করিয়া থাকেন এবং ইহাই ভজনর প্রকৃত প্রণালী।

সাধক সাধনপথে যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার সাধনার তিনটী অবস্থা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতে আরব্ধ হয়। সে তিনটী অবস্থা "দশা" নামে অভিহিত,—বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশা। বহ্যদশায় বিশুদ্ধ ভক্তভাব,—অদ্ধবাহ্যে ব্রজলীলা-পরিকরে প্রবেশের কিঞ্চিৎ স্ফুর্ত্তি,—আর অন্তর্দ্দশায় একবারেই সাক্ষাৎ লীলায় প্রবেশ ও লীলা প্রাকট্যের পূর্ণ দর্শন ও লীলারসের পূর্ণ আস্বাদনলাভ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়েই অন্তর্দ্দশায় বিভোর থাকিতেন। তিনি যখন নাম জপ করিতেন, সে জপকালেও তিনি সাক্ষাৎ লীলা সন্দর্শন করিতেন, ব্রজলীলায় মগ্ন থাকিতেন। এ কথা একটু পরে কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলিব। এখানে তাঁহার অর্দ্ধ বাহ্যদশার একটীমাত্র আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সেবাপরিচর্য্যার জন্য একজন দাস ব্রজ-বাসী ছিলেন। গোস্বামী তাঁহাকে অতীব স্নেহ করিতেন। ব্রজ-বাসি মহাশয় পিতৃভক্ত পুত্রের ন্যায়, ভক্তিমান শিষ্যের ন্যায় শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সেবা করিতেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রভুপাদ একবারে আহার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক দোনার অতিরিক্ত তক্র পান করেন না। দোনাটী অতি ছোট। সেটী একটু বড় হইলে প্রভুর আহার কিঞ্চিৎ অধিক হইবে এই মনে করিয়া সখীস্থলী নামক গ্রামে গিয়া বড় রকমের একটী পলাশপত্র আনিলেন। তাহাদ্বারা দোনা প্রস্তুত করিলেন। সেই দোনায় তক্র লইয়া গোস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন তিনি তন্দ্রার ন্যায় অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন। দাস ব্রজবাসি মহাশয় একটু দাঁড়াইলেন। গোস্বামিপাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। তিনি তক্রপূর্ণ নব পলাশপত্র নির্ম্মিত দোনা গোস্বামিপাদের হস্তে দিলেন। শ্রীমদ্ গোস্বামী দোনা দেখিয়া বলিলেন, "এত বড় পাতাটীতে দোনা নির্ম্মাণ করিয়াছ কেন? এ পাতা কোথা পাইলে? ব্রজবাসী বলিলেন, আজ গোচারণে সখীস্থল গ্রামে গিয়াছিলাম। পলাশের এই উত্তম পাতাটী দেখিতে পাইলাম, তাই আনিয়াছি। সখীস্থলী গ্রামের নাম শুনা মাত্রই তিনি ক্রোধে তক্রপূর্ণ দোনাটী দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সাবধান, আর কখনও চন্দ্রাবলীর গ্রামে যাইবে না।"

যদিও শ্রীমদ্দাস গোস্বামী দাস ব্রজবাসীর সহিত এত গুলি কথা বলিলেন, যদিও তিনি নূতন পলাশ পাতার দোনাটী পর্য্যন্ত চিনিলেন কিন্তু তথাপি সে সময়ে তাহার পূর্ণ বাহ্য দশা উপস্থিত হয় নাই। তিনি তখনও শ্রীরাধার বাসক শয্যার উৎকণ্ঠা লীলায় বিভোর ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আছেন, এ দিকে গোস্বামীর স্বামিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আশায় উৎকণ্ঠায় সারানিশি যাপন করিতেছেন। শ্রীরাধ-প্রেমের অংশ-ভোগিনী শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীরাধিকার প্রিয় দাসী-গণের ক্রোধ হইতেছে। ললিতা তাঁহাকে মানের মন্ত্র শিখাইতেছেন। শ্রীরতিমঞ্জুরী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারই অনুমোদন করিতেছেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী তখন সিদ্ধদেহে এই শ্রীরতিমঞ্জুরী। যখন দাস ব্রজবাসী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখনও এই অন্তর্দ্দশার সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তাই তিনি চন্দ্রাবলীর গ্রামের নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। সাধক দেহে সিদ্ধক্রিয়া কি প্রকারে ঘটে দাস ব্রজ-বাসী তাহা বুঝিয়া চমৎকৃত হইলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী অন্তর্দ্দশায় কিরূপে ভজন করিতেন তৎকৃত সুদীর্ঘ বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্রেই তাঁহার সেই সিদ্ধাবস্থার ভাব ও ভজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইতে পারে। তিনি ললিতার অনুগতা দাসী ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবায় বিভোর থাকিতেন। চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন প্রেমের নিত্য নূতন কাব্য-রাজ্য। এখানে জরামৃত্যু

নাই, রোগ জ্বালা নাই, পার্থিব অভাবের হাহুতাশ নাই, এখানে আছে কেবল প্রেমের আলাপ, প্রেমের বিলাপ ও প্রেমের প্রলাপ। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী অধিক সময়েই অন্তর্দ্দশায় শ্রীমতীর সেবাদাসী ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রেমরাজ্যে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবিলাসিনীর রসবতী অনুচারিণীরূপে সততই তাঁহার প্রিয়সেবায় নিমগ্ন রহিয়া আনন্দ-বৃন্দাবন-মাধুর্য্যে বিভোর রহিতেন।

তাঁহার ব্রজবিলাস স্তব বাহ্য দশার প্রার্থনা মাত্র। ব্রজবিলাস স্তবের প্রারম্ভে রঘুনাথ নিজের ক্লেশ দুঃখ ও বার্দ্ধক্যের পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন :—

> দগ্ধং বার্দ্ধকবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা
> বিদ্ধং মামতি পারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদি সিংহৈর্বৃতম্।
> স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্পায়য় শ্রীহরে
> যৈর্নৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে॥

"অর্থাৎ আমি বার্দ্ধক্য-দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি, ভয়ঙ্কর অন্ধতা কালসর্পে আমাকে দংশন করিতেছে, পরাধীনতারূপ শাণিতশরে এবং ক্রোধাদিরূপ সিংহ সমূহে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছি হে হরে, হে স্বামিন্, আমি যাহাতে এই সমস্ত উপদ্রব পরাজয় করিতে পারি এবং সুস্থ চিত্তে নিরন্তর তোমার ভজনা করিতে পারি, করুণা করিয়া আমাকে সেই প্রেমসুধারস অতি সত্বরে পান করাও।" এই বলিয়া নিজ ক্লেশ জ্ঞাপন করিয়া তিনি লালসাময়ী ব্রজবিলাস স্তব রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু বিলাপ কুসুমাঞ্জলিতে তিনি বৃদ্ধ পুরুষ নহেন,-- অতি সুন্দরী রসময়ী তরুণ যুবতী, প্রেমময়ীর প্রিয়তমা অনুচারিণী। তাঁহার স্বামিনীর অদর্শনজনিত বিরহই তাহার মহাক্লেশ। তাহার শ্রীচরণ দর্শনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সাক্ষাৎ সেবাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। বিলাপ কুসুমাঞ্জলিও লালসাময়ী প্রার্থনা। কিন্তু ইহাতে তিনি দাসীরূপে সেবা-লালসায় ব্যাকুলিতা। ব্রজবিলাস স্তবে বাহ্যনেত্রের অভাবে দুঃখের কথা আছে। কিন্তু বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে সে দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে।

সুন্দর সিদ্ধ তনুতে দিব্যনেত্র পাইয়া এই নূতন সেবাদাসী এইরূপে হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন যথা :—

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরীরূপ পূর্ব্বা
ব্রজভুবি বতনেত্র দ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষাসংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥

অর্থাৎ "হে বৃন্দাবনেশ্বরি, যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয়া রূপমঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রণালী শিক্ষার জন্য আমার দিব্যনেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলক্তক দর্শনে আমার অভিলাষ হইয়াছে।"

এই স্তবে অন্তর্দ্দশায় সাক্ষাৎ সেবার নিদর্শনসূচক প্রমাণ বচনও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

যা তে কাঞ্চুলীরত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজয়োরর্পিতা।
শ্যামচ্ছাদনকাময়া কিল ন সা তথ্যেতিবিজ্ঞায়তাম্॥
কিন্তু স্বামিনি কৃষ্ণএব সহসা তত্তামবাপ্য স্বয়ং।
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকঃ স্বকং নিধিযুগং সঙ্গোপয়ত্যেবহি॥

অর্থাৎ "সুন্দরি, শ্রীকৃষ্ণ না দেখিতে পান, এই মনে করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হইতে গোপন ক ব জন্য আমি যে তোমার স্তনোপরি কঞ্চুলী অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা যে মিথ্যা এমন মনে করিও না; শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া উহাকে আত প্রিয়তম মনে করিয়াই সঙ্গোপন করিয়াছেন।"

এই স্তবে শ্রীদাস গোস্বামী স্বায় পুরুষদেহের স্মৃতি-রহিত হইয়া সুধারাশিময় রাধাপদে দাসীভাবে সেবা-অধিকারের প্রার্থনা করিয়াছেন। কি প্রকারে তিনি শ্রীমতীকে স্নান করাইবেন, কি প্রকারে তিনি তাঁহাকে বসনে ভূষণে সজ্জিত করিবেন, কি প্রকারে তিনি তাঁহার স্তনযুগল গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিত্রিত করিবেন, কি প্রকারেই বা অন্যান্য বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিবেন, এই সকল লালসাময়ী প্রার্থনাতেই এই বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তব বিরচিত হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধুর ভাব

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাতেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। উহা বঙ্গভাষার অতুল সম্পত্তি, বৈষ্ণব সাধকের একমাত্র সাধন সম্বল। বাঙ্গালী বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে ঠাকুর মহাশয় এই লালসাময়ী প্রার্থনা শ্রীবৃন্দাবনের অদ্ভুত রসসুধা। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তব এবং ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা একই ভাবের রসসুধায় পরিপূর্ণ। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভজন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি এই প্রার্থনা-নির্দ্দিষ্ট সাক্ষাৎ সেবায়। তাঁহার প্রেমপুরাভিধ স্তোত্র, স্বসঙ্কল্প স্তোত্র, প্রার্থনামৃত প্রভৃতি স্তোত্রেও লালসাময়ী প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল স্তোত্রের অনেক স্থলেই তাঁহার ব্রজলীলার স্বরূপাবস্থানসূচক প্রমাণও স্পষ্টতঃই লিখিত রহিয়াছে।

তিনি এইরূপ মানসিক সেবার ভাবে বিভাবিত হইয়াই প্রাকৃত দেহের শেষের দিনগুলি যাপন করিতেছিলেন। ক্রমেই তাঁহার নিত্য স্বরূপাবস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, ক্রমেই দেহ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িল, তখন—

রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফূরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেম-অশ্রু পড়ে,
রাধা পদ করয়ে স্মরণ॥ *

---

* একখানি হস্তলিখিত সূচকে "রাধা পদ করয়ে স্মরণ" এই পাঠ পাইয়াছি। কিন্তু পদকল্পতরুতে "মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ" এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীরাধা-নিষ্ঠতা।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্তবাবলী অভিনিবিষ্ট ভাবে পাঠ করিলে বুঝা যায়, শ্রীরাধিকাই যেন তাঁহার পর দেবতা। বিশেষতঃ ইনি যখন তত্ত্বতঃ শ্রীমতীর সেবাদাসী রতিমঞ্জরী, তখন রাধাপদের দাস্য ভিন্ন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্যের লালসা কি প্রকারেই বা সম্ভবপর হইবে? অপরন্তু গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইহাকে শ্রীরাধাপদে অর্পণের ইঙ্গিত আদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী মনঃশিক্ষার অষ্টম পদ্যে লিখিয়াছেন :—

যথা দুষ্টং ত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপযা।
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বল মসৌ॥
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং।
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিবিবরমিহ ত্বং ভজ মনঃ॥

অর্থাৎ "হে মন! তুমি গোষ্ঠে শ্রীগিরিধরকে এরূপ কাকুবাক্যে ভজনা কর যে, তিনি যেন এই শঠের চিত্তদুষ্টতা দূর করেন, কৃপাপূর্ব্বক প্রেমামৃত দান করেন এবং শ্রীরাধিকা ভজনে যেন আমাকে প্রেরণ করেন।" বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটি কথা এই যে

সর্ব্বদেব মাগি লবে কৃষ্ণভক্তি বর॥

কিন্তু দাসগোস্বামীর মনঃশিক্ষার উপদেশ এই যে, হে মন, তুমি এমন কাকুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর যে তিনি যেন দয়া করিয়া—প্রেমদান করেন এবং প্রেমময়ী শ্রীরাধার ভজনে যেন প্রেরণ করেন।

আবার ঐ মনঃশিক্ষার দশম পদ্যে লিখিত হইয়াছে :—

রতিং গৌরীলীলে অপিতপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ।
শচী লক্ষ্মীঃ সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ॥
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ নবীন ব্রজসতীঃ।
ক্ষিপত্যরাদ্‌যাতাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার সৌন্দর্য্যকিরণে রতি, গৌরী ও লীলা সতত সন্তপ্ত, যাঁহার সৌভাগ্যে শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামা পরাভূত, এবং যাঁহার

বশীকাব গুণবাজিতে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নব ন ব্রজসতীরা অভিসন্তপ্ত, হে মন সর্ব্বদা সেই হবিপ্রিয়া শ্রীবাধাব ভজনা কব।

ব্রজবিলাসে লিখিত আছে ঃ—

বাগেণ রূপমঞ্জর্য্যা বশীকৃত মুবদ্বিষঃ।
গুণাবাধিত বাধাযাঃ পাদযুগ্মে বতির্মম॥

অর্থাৎ রূপমঞ্জুবী অনুবাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহাব অনুবক্ত কবিয়া দিযাছেন, সেই বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সকলেব দ্বাবা আবাধিতা শ্রীবাধাব পদ-যুগলে আমাব বতি হউক।

স্বনিযমদশকে লিখিত হইযাছে ঃ—

অজাণ্ডে বাধেতি স্ফুবদভিধযাসিক্ত জনযা।
হনযা সাকং কৃষ্ণং ভজতি যঃ ইহ প্রেমনমিতঃ॥
পবং প্রক্ষাল্যো তচ্চবণকমলে ভজ্জনমহো।
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিবসি চ বন্দামি প্রতিদিনম॥

অর্থাৎ "বাধা" এই স্ফূর্ত্তিযুক্ত নাম শ্রবণে ব্রহ্মাণ্ডেব নিখিল জনগণ প্রেমবসে অভিসিক্ত হয। হে প্রেমিক সকল, এই শ্রীবাধাব সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি প্রেমনমিত ভাবে উপাসনা কবে, আমি তাঁহাব চবণামৃত ভক্তিপূর্ব্বক পান কবি ও মস্তকে ধাবণ কবি।

বিশাখানন্দন স্তোত্রে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী লিখিযাছেন, আমি অতি দুষ্ট, নিষ্ঠুব ও শঠ। কিন্তু শ্রীবাধাব পাদপদ্মই আমাব একমাত্র আশ্রয়। আমি কাতব কণ্ঠেব বোদন কবিযা দিবানিশি এই প্রার্থনা কবিতেছি যে, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী করুণা পুবঃসব আমাকে নিজ দাসীগণেব অন্তর্ভুক্ত কবিযা নিজসেবায় নিযুক্ত করুন তিনি ভিন্ন আব আমাব অন্য গতি নাই।

বঘুনাথ নিবন্তব কাতবকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বলিতেন ঃ—

ভজামি বাধা মরবিন্দনেত্রাং
স্মবামি বাধাং মধুবস্মিতাস্যাং।
বদামি বাধাং করুণাভবার্দ্রাং
ততো মমান্যাস্তি গতি র্ন কাহপি॥

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি স্তবেও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধাদাস্যলালসা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা ঃ—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

অর্থাৎ হে দেবি, তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতিরেক আমি কোন কালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার দাস্যেই যেন আমার অনুরাগ নিত্য বর্দ্ধিত হয়।

আশাভরৈরমৃত সিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতি গমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাংময়িবিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ ব্রজেনচ বরোরু বকারিণাপি॥

অর্থাৎ শ্রীরাধে, সংপ্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছি, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা এ ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।"

স্বনিয়ম দশকে এই ভাবের আরও একটী পদ্য আছে যথা ঃ—

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ।
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপিচ নিগমৈস্তৎ প্রিয়তমাম্॥
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া।
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥

অর্থাৎ "বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদমন্ত্রে যাহার গান করিয়াছেন, সেই প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দাম্ভিকতা বশতঃ অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করে, তাহার অপবিত্র সমীপ-দেশে আমি ক্ষণকালও গমন করি না, ইহাই আমার স্থিরব্রত।" শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর এই শ্রীরাধানিষ্ঠতা ভজনের এক প্রধান নিয়ম মধ্যে পরি-গণিত ছিল।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধানিষ্ঠতার দৃঢ়তর প্রবলভাব, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, প্রেমপুরাভিধস্তোত্র, শ্রীরাধাষ্টক, প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তব, স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ স্তব, নবাষ্টক, উৎকণ্ঠা দশক, অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টক ও অভীষ্ট স্থচন স্তোত্রে পূর্ণরূপে সূচিত হইয়াছে। এ স্থলেভক্ত পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত কতিপয় স্তোত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

শ্রীরাধিকাষ্টকম্।

(১)

রসবলিতমৃগাক্ষী মৌলিমাণিক্যলক্ষ্মীঃ
প্রমুদিতমুরবৈরী প্রেমবাপীমরালী।
ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্যগীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাংকদানু॥

(২)

স্ফুরদরুণ দুকুলদ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব
স্থলমভিধরকাঞ্চী লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলসবিলাসস্ফীত মুক্তাসরশ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥

(৩)

সরসিজবরগর্ভা খর্ব্বকান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম ঘনসারাশ্লিষ্ট কৈশোরসীধুঃ।
দরবিকসিত হাসস্যন্দি বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥

(৪)

অতি চটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥

(৫)

ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রং।
সুললিত ললিতান্তঃ স্নেহফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥

(৬)

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথ প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তি বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়বরোরঃ প্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥

(৭)

প্রকটিত নিজবাসং স্নিগ্ধবেণু প্রণাদৈ
দ্রু তগতি হরিমারাৎ প্রাপ্যকুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥

(৮)

অমলকমলরাজি স্পর্শিবাত প্রশীতে
নিজ সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥

(৯)

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশাসন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিত স্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়া স্তনোতি ॥

ইতি শ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজঃ।

(১)

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাম্॥

২

কারুণ্যামৃতবীচীভি স্তারুণ্যামৃত ধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্॥

(৩)

হ্রী পট্টবস্ত্র গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যাঘুসৃণাঞ্চিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিত কলেবরাম্॥

(৪)

কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদ রক্ততা।
উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভি রুত্তমৈঃ॥

(৫)

ক্লৃপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং।
ধীরাধীরত্বসদ্বাস পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্॥

(৬)

প্রচ্ছন্নমান ধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনাম যশঃশ্রাব বতংসোল্লাসি কর্ণিকাম্॥

(৭)

রাগতাম্বুল রক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাং।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দ স্মিত কর্পূর বাসিতাম্॥

(৮)

সৌরভান্তঃ পুরে গর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যবিচলত্তরলাঞ্চিতাম্॥

(৯)

প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং।
সপত্নীবক্তহৃচ্ছোষিযশঃশ্রীকচ্ছপীং বদাম॥

(১০)

মধুতাম্বুলসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলীপরিবেশিকাম্‌॥

(১১)

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্‌॥

(১২)

নমুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্‌॥

(১৩)

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তস্যাস্তদাস্যমাপ্নুয়াৎ॥

উৎকণ্ঠাদশকম্‌।

(১)

ছিন্নস্বর্ণবিনিন্দিচিক্কণরুচিং স্মেরাং বরঃসন্ধিতো
রম্যাং রক্তসুচীনপট্টবসনাবেশেন বিভ্রাজিতাং।
উদ্‌ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠপিঞ্ছবিলসদ্বেণীং মুকুন্দং মনাক্‌
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে॥

(২)

যস্যাঃ কান্তিতরঙ্গসংপরিমলেনোদ্দীপ্য উচ্চৈঃ স্ফুর-
দ্গোপীবৃন্দমুখারবিন্দমধু তৎপ্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্‌ নর্ম্মানি রঙ্গগীতি নদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ স তাং
বৃন্দারণ্যবরেণ্যকল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে॥

(৩)

শ্রীমৎকুণ্ডতটীকুড়ুঙ্গভবনে ক্রীড়কলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল মল্লিকোমলদলৈঃ ক্লিপ্তে মুহু র্মাধবম্।
জিত্বা মানিনমোক্ষ সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্গুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে॥

(৪)

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভি র্বৃতাং
ভাবৈ রষ্টভিরেব সাত্ত্বিকভরৈ র্লাস্যং রসৈস্তন্বতীং।
বীণাবেণুমৃদঙ্গকিঙ্কিণিচলন্মঞ্জরীচূড়োচ্ছল-
দ্ধানৈঃ স্ফীতসুগীতমঞ্জুনিতরাং রাধাং কদাহং ভজে॥

(৫)

উদ্দাম স্মরকেলি সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃস্থলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিতপীনপর্ব্বত কুচদ্বন্দ্বাং নখৈ রস্ত্রকৈঃ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধুর মহো তং বিদ্ধ মাকুর্ব্বীতং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষ মহো রাধাং কদাহং ভজে॥

(৬)

মিত্রাণাং নিকরৈ র্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদানমিষেণ বর্ত্মনি হঠাদ্দম্ভেন রুদ্ধাঞ্চলাং।
সার্দ্ধং স্মের সখীভিরুদ্ধুরগিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈ বিলসচ্চকোরনয়নাং রাধাং কদাহং ভজে॥

(৭)

পারাবারবিহার কৌতুকমনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানসজাহ্নবী জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাং।
জীর্ণা নৌ র্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা
পারে খণ্ডিতকঞ্চুলিং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে॥

(৮)

উল্লাসৈ র্জলকেলি লোলুপ মন পূরে নিদগোদগমে
ক্ষেলী লম্পটমানসাভি রভিতঃ সায়ং সখীভি র্বৃতাং।

গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিলক্রীড়াবিদগ্ধং করৈঃ
সিঞ্চন্তীং জলযন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥

(৯)

বাসন্তী কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্যবিস্তারিণা
স্বেনালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটং।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈ র্মুরভিদা দ্রাগ্ ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥

(১০)

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক প্রিয়া মুররিপো র্যা হন্ত যস্যা অপি
স্বীয় প্রাণ পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতা স্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জ্বাল কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ শিরোঽগ্র ভূষণমণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥

(১১)

উৎকণ্ঠা দশকস্তবেন নিতরাং নব্যেন দিব্যৈঃ স্বরৈ
র্বৃন্দারণ্য মহেন্দ্রপট্টমহিষীং য স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ।
তস্মৈ প্রাণসমা গুণান্নুরসনাৎ সংজাত হর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘ মভীষ্টরত্ন মচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ॥

ইত্যুৎকণ্ঠাদশকম্।

প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম।

(১)

অলং দীপাবল্যা বিপুলবতি গোবর্দ্ধনগিরিং
জনন্যা সংপূজ্যোজ্জ্বলিত মহীলোদগীতকুতুকৈঃ।
নিশাদ্রাবৈঃ পৃষ্ঠে রচিত করলক্ষ্মশ্রিয়মসৌ
বহন্ মেঘধ্বানৈঃ কলস গিরিভৃৎ খেলয়তি গাঃ ॥

(২)

পুরো গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজনৃপতিমুখ্যা ব্রজজনা
ব্রজন্ত্যেষাং পশ্চান্নিখিল মহিলাভি র্ব্রজনৃপা।
ততো মিত্রব্রাতৈঃ কৃতবিবিধ নর্ম্ম ব্রজশশী
চ্ছলৈঃ পশ্যন্ রাধাং সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্ ॥

(৩)

উদঞ্চৎ কারুণ্যামৃতবিতরণৈ র্জীবিত জগ-
দয়ুব্দন্দ্বং গন্ধৈ গু র্ণস্থমনসাং বাসিতজনম্।
কৃপাঞ্চেন্ময্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকল মঙ্গং নিবসতি।

(৪)

উদ্দাম নর্ম্ম রসকেলি বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধামুকুন্দযুগলং ললিতাবিশাখে।
গৌরাঙ্গচন্দ্র মিহ রূপযুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাং কতি সহে স্ফুট রে ললাট।

(৫)

ব্রজপতি কৃত পর্ব্বানন্দি নন্দীশ্বরোদ্যৎ-
পরিষদি বদনান্তঃ স্মেরতাং রাধিকায়াং।
রচয়তি হরিরারাদ্দৃগ্বিভঙ্গেন নদ্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ ॥

(৬)

উপগিরি গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে
ভ্রমতি নিভৃত রাধা নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন।
অতিতৃষিত চকোরীলালসেবাম্বুদস্যো
পবি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য আকাশদেশম্ ॥

(৭)

দ্যুতিজিত রতি গৌরী শ্মা রমা সত্যভামা-
ব্রজপুর ববনারীবৃন্দ চন্দ্রাবলীকাম্।

গিরিভৃত ইহ রাধাং তন্বতো মণ্ডিতাং তৎ
তদুপকরণ মগ্রে কিং নিধাস্তে ক্রমেণ ॥

(৮)

কনকরচিতকুম্ভদ্বন্দ্ব বিন্যাসভঙ্গী-
রুচিহর কুচযুগ্মং সৌরভোচ্ছূনমস্যাঃ ।
সপুলকমথ গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছো-
র্গিরিভৃত ইহ হস্তে হস্ত দাস্যে কদা তান্ ॥

(৯)

কৃষ্ণস্যাংসে বিনিহিতভুজাবল্লিরুৎফুল্লরোমা
রামা কেয়ং কলয়তি তরাং ভূধরারণ্যলক্ষ্মীম্ ।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয় চটুল ব্যাকুলা রাগপূরৈ-
রন্যা কান্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা ॥

(১০)

অপূর্ব্ব প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ ফেণনিবহৈঃ
সদা যো জীবাতু র্যমিম কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্ ।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদ বিপদ্দাব বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥

(১১)

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রো হজগরায়তে
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥

(১২)

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈ র্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি ।
অয়মপি পরহেতু র্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা ॥

(১৩)

গিরিবরতট কুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশা-
সরসিচ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ কীর্ত্তিম্ ।

ধৃতরতি রমণীস্বং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজদধি ফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥

(১৪)

বসতো গিরিবরকুঞ্জে
লপতঃ শ্রীরাধিকে হন্দুক্লঞ্চেতি।
ধয়তো ব্রজদধিতক্রং
নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥

ইতি প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকং।

অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টকম্।

(১)

কদা গোষ্ঠে গোষ্ঠক্ষিতিপগৃহদেব্যা কিলতয়া
সবাষ্পং কুর্ব্বত্যা বিলসতি সুতে লালনবিধিম্।
মুহুদৃষ্টাং রোহিণ্যপিহিত নিবেশামবনতাং
নিষেবে তাম্বুলৈ রঙ্গমপি বিশাখা প্রিয়সখীম্ ॥

(২)

কদা গান্ধর্ব্বায়াং শুচি বিরচয়ন্ত্যাং হরিকৃতে
মুদা হারান্ বৃন্দে সহ সবয়সামাত্মসদনে।
বিচিত্য শ্রীহস্তে মণিমিহ মুহুঃ সম্পুটচয়া-
দহো বিন্যস্যন্তী সফলয়তি সেয়ং ভুজলতাম্ ॥

(৩)

কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিদধতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিকমধুপ মুখ্যাভিরভিতঃ
প্রজাভিঃ সংযুক্তা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা ॥

(৪)

কদা কুণ্ডাতীরে ত্রিচতুরসখীভিঃ সমমহো
প্রসূনং গুম্ফন্তীঃ রবিসখস্বভামানততয়া।
সমেত্য প্রচ্ছন্নং সপদি পরিরিপ্সোর্বকরিপোঃ
নিষেধে ভ্রূভঙ্গাং ভৃশ মনুভজেঽহং ব্রজনিনী॥

(৫)

কদা শুভ্রে তস্মিন্‌ পুলিনবলয়ে রাসমহনা
সুবর্ণাঙ্গী সজ্যেষহমহমিকা মত্ত মতিষু।
হরৌযাতে নীলোপললনিকষতাং জিত্বরগুণা-
দ্‌গুণা দস্মান্‌ দিব্যদ্রবিণমিন রাধা মদয়তি॥

(৬)

কদা ভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে
বরা মধ্যাসীনাং কুসুমময়তূলীমতুলিতাং।
প্রিয়ে চিত্রং পত্রং লিখতি নিহিত স্বাঙ্গলতিকাং
বিশাখাপ্রাণালীং ভজতি দিশতী বর্ণকমসৌ॥

(৭)

কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশৃঙ্গে ব্রততিজান্‌
প্রিয়ে পূর্ব্বলীলা নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্‌।
মদেনাবিস্পষ্টাং শকলিতপদাং ব্রীড়িততয়া-
ক্রুতা মোৎক্যোনৈষা বিরচয়তি পৃচ্ছাং মম পুরঃ।

(৮)

গতি র্যস্মে নিত্যা যদখিলমপি স্বং সবয়সাং
মদীশ্বর্য্যাঃ প্রেষ্ঠ প্রণয়কৃতসৌভাগ্যবরিমা।
হরে র্যৎপ্রেমশ্রী র্নিবসতি রমুষ্যা স্তলনয়া
সদা তস্মিন্‌ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দৃশি।

ইত্যভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্‌॥

প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্।

(১)

মধুমধুর নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিতকুসুমসুবাসাঃ ক্লিপ্তকর্পূর ভূষা।
সুবলসখমুপেতা দূতিকা-ন্যস্ত-হস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥

(২ (

স্মরগৃহমবিশন্তী বাম্যতো ধামগন্তুং
সরণিমনুসরন্তী তেন সংরুদ্ধ্য তূর্ণম্।
বলসবলিত কাক্কা লম্ভিতান্তঃস্মিতাক্ষী
ক্ষণপমি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥

(৩)

মুদিররুচির বক্ষস্যুন্নতে মাধবস্য
স্থিরচরবর বিদ্যুদ্বল্লিবন্মল্লিতল্পে।
ললিত কনকযূথীমালিকাবচ্চ ভান্তী
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥

(৪)

স্মরবিলসিত তল্পে জল্পলীলামর্নাল্পাং
ক্রমকৃতিপরিহীনাং বিভ্রতি তেন সার্দ্ধম্।
মিথ ইব পরিরম্ভা রম্ভবৃত্তৈকবর্ম্মা
ক্ষণমপি মম বাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥

(৫)

প্রমদমদনযুদ্ধশ্রান্তিতঃ কান্ত কৃষ্ণ
প্রচুরসুখদবক্ষঃস্ফার তল্পে স্বপন্তী।
রসমুদিত বিশাখা জীবিতাদ্ধা সমৃদ্ধা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্ ॥

(৬)

অপি বত সুরভাস্তে প্রৌঢ়ি সৌভাগ্য দৃপ্যৎ
প্রণয়ধৃত সুসখ্যোন্মাদ মত্তোরুগর্ব্বৈঃ।
দরগদিত মুকুন্দাকল্পিতাকল্পতল্পা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥

(৭)

স্মরদয়তি নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে ব্যাবহাস্যং
ব্রজনবযুবরাজংব ক্রিমাড়ম্বরেণ।
সদসি পরিভবন্তী সংস্তুতালীকুলেন
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥

(৮)

ক্বচন চ দরদোষাদ্দৈবতঃ কৃষ্ণজাতাৎ
সপদি বিহিতমানা মৌনিনী তত্র তেন।
প্রকটিতপটুচাটু প্রার্থ্যমানপ্রসাদা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥

(৯)

পিতুরিহ বৃষভানোর্ভাগ্যভঙ্গী বকারেং
প্রণয়বিপিনভৃঙ্গীসঙ্গিনী তস্য দেবি।
নিজগণ কুমুদালেঃ কৌমুদী হা কৃপ'ব্ধে
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥

(১০)

নিরবধি গুণসিন্ধো ভদ্রসেনাদিবন্ধো
নিরুপমগুণবৃন্দপ্রেয়সীবৃন্দমৌলে।
অতি কদন সমুদ্রে মজ্জতো হা কৃপাদ্রে
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥

(১১)

নটয়তি রুচিনান্দীমুন্নয়ন্ সূত্রধার
প্রবর ইব রসজ্ঞা নর্ত্তকীং রঙ্গরূপে।
রসবতি দশকে হস্মিন্ প্রেমপূরাভিধে যঃ
স সপদি লভতে তৎ স্বন্দরত্নপ্রসাদম্॥

ইতি শ্রীপ্রেমপূরাভিধ স্তোত্রম্।

অভীষ্টসূচন-স্তোত্রম।

(১)

আভীরপল্লীপতিপুত্রকান্তা-
দাস্যাভিলাসাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তি সংস্থো
মৎ স্বান্ত দুর্দ্দান্ত হয়েচ্ছুরাস্তাং॥

(২)

যদৃযত্নতঃ শম দমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্ম লগ্নমবিকার মভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং মদয়াবলোক-
মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈ রিদানীম্॥

(৩)

নিভৃত বিপিনলীলাঃ কৃষ্ণবক্তুঃ সদাক্ষ্ণা
প্রপিবথ মৃগকন্যা য়ূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা-
প্যুদর ভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্॥

(৪)

মন্মানসোন্মীলদনেক সঙ্গম-
প্রয়াস কুঞ্জোদরলব্ধ সঙ্গয়োঃ।

নিবেদ্য সখ্যর্পয় মাং স্বসেবনে
বীটীপ্রদানাবসরে ব্রজেশয়োঃ ॥

(৫)

নিবিড় রতিবিলাসায়াসগাঢ়ালসাঙ্গীং
শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগণ্ডাং নু রাধাম্।
ব্রজপতিসুতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত দেহা-
মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥

(৬)

দিতিজকুলনিতান্তধ্বান্ত মশ্রান্ত মস্যন্
স্বজনজনচকোরপ্রেমপীযূষবর্ষী।
করশিশিরিত রাধা কৈরবোৎফুল্লবল্লী-
কুচকুসুমগুলুচ্ছঃ পাতু কৃষ্ণৌষধীশঃ ॥

(৭)

রাসে লাস্যং রসবতিসমং রাধয়া মাধবস্য
শ্লাভৃৎকচ্ছে দধিকর কৃতে স্ফারকেলী বিবাদম্।
আলীমধ্যে স্মর, পবনজং নর্ম্মভঙ্গীতরঙ্গং
কালে কস্মিন্ কুশলভরিতে হন্ত সাক্ষাৎ করোমি ॥

(৮)

রোহিণ্যগ্রে কৃতাশীঃ শতমথসভয়ানন্দমাভীরভর্ত্তা
ভীত্যা শশ্বন্নৃসিংহে হলিনি সখিকুলে ন্যস্য সাস্রং ব্রজেশ্যা।
সাটোপ স্নেহমুদ্যদ্ব্রজজননিবহৈ রাধিকাদিপ্রিয়াভিঃ
সশ্লাঘং বীক্ষমাণঃ শ্রিতসুরভিরটন্নব্যগোপঃ স পায়াৎ ॥

(৯)

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্ফুরতি সখি কেয়ং ব্রজবধূঃ
কুতোঽস্মিন্নায়াতা ভজিতু মতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ।
অপূর্ব্বেণাপূর্ব্বাং রময় হরিণৈনামিতি স রা-
ধিকোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত যুবতিস্বঃ স্মিতমধাৎ ॥

(১০)

রাধেতি নাম নবসুন্দর সীধু মুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধম্।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগ হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে॥

(১১)

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎ কুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিধেহি নিজ চিন্তন ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ।
কিঞ্চাপরাধ তিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতিং মাম্॥

(১২)

পিকপটু রববাদ্যৈ ভৃর্ঙ্গঝঙ্কার গানৈঃ
স্ফুরদতুল কুড়ুঙ্গ ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্।
স্মরসদসি কৃতোদ্যন্নৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ামি॥

(১৩)

যৎপাদাম্বুজযুগ্মবিচ্যুতরজঃ সেবাপ্রভাবাদহং
গান্ধর্ব্বা সরসী গিরীন্দ্র নিকটে কষ্টোঽপি নিত্যং বসন্।
তৎপ্রেয়ো গণ পালিতো জিতসুধা ধারামুকুন্দাভিধা
উদ্গায়ামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোঽবতু॥

ইত্যভীষ্টসূচনং।

স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রম্।

(১)

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কম।
অসাম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ॥

(২)

নবং দিব্যং কাব্যং স্বকৃতমতুলং নাটককুলং
প্রহেলী গূঢ়ার্থাঃ সখি রুচির বীণাধ্বনিগতীঃ।
কদা স্নেহোল্লাসৈ র্লিত ললিতা প্রেরণবলাৎ
সলজ্জং গান্ধর্ব্বা সরস মসকৃচ্ছিক্ষয়তি মাম্॥

(৩)

অলংমানগ্রন্থে নিভৃত চটু মোক্ষায় নিভৃতং
মুকুন্দে হাহেতি প্রথয়তি নিতান্তং ময়ি জনে।
তদর্থং গান্ধর্ব্বাচরণপতিতং প্রেক্ষ্য কুটিলং
কদা প্রেমক্রৌর্য্যাৎ প্রখর ললিতা ভৎর্সয়তি মাম্॥

(৪)

মুদা বৈদগ্ধ্যান্তর্ললিত নবকর্পূর মিলন-
স্ফুরন্মানা নর্ম্মোৎকর মধুর মাধ্বীকরচনে।
সগর্ব্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরকৃতে প্রেমবিবশা
বিশাখা মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদ্যুগসখী॥

(৫)

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপিচ রুচির শিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মিন্মণিপদক হারানিহ মুহুঃ॥

(৬)

ক্বচিৎ কুঞ্জে কুঞ্জে চ্ছলমিলিত গোপালমন্থু তাং
মদীশাং মধ্যাহ্নে প্রিয়তর সখীবৃন্দবলিতাম্।
সুধাজৈত্রৈ রত্নৈঃ পচনরসবিচ্চম্পকলতা
কৃতোদ্যচ্ছিক্ষোঽয়ং জন ইহ কদা ভোজয়তি ভোঃ॥

(৭)

ক্বচিৎ কুঞ্জক্ষেত্রে স্মরবিষমসংগ্রাম গরিম-
ক্ষরচ্চিত্রশ্রেণীং ব্রজযুবযুগস্যোৎকটমদৈঃ।
বিধত্তে সোল্লাসং পুনরলময়ং পর্ণকচয়ৈ
র্বিচিত্রৈঃ চিত্রাতঃ সখি কপিতশিক্ষোঽপ্যমুজনঃ॥

(৮)

পরং তুঙ্গাদ্যা যৌবতসদসি বিদ্যাৎদ্ভুতগুণৈঃ
স্ফুটং জিত্বা পদ্মাপ্রভৃতি নবনারী ভ্র্রমতি যা।
জনোঽয়ং সম্পাদ্যঃ সখি বিবিধ বিদ্যাস্পদতয়া
তয়া কিং শ্রীনাথাচ্ছলনিহিত নেত্রেঙ্গিত লবৈ॥

(৯)

স্ফুরন্মুক্তা গুঞ্জামণি সুমনসাং হাররচনে
মুদেন্দোর্লেখা মে রচয়তু তথা শিক্ষণবিধিং।
যথা তৈঃ সংক্লিপ্তৈর্দয়িতসরসীমধ্যসদনে
স্ফুটং রাধাকৃষ্ণাবয়মপি জনো ভূষয়তি তৌ॥

(১০)

অয়ে পূর্ব্বং রঙ্গেত্যমৃতময় বর্ণদ্বয় রস-
স্ফুরদ্দেবী প্রার্থ্যং নটনপটলং শিক্ষয়তি চেৎ।
তদা রাসে দৃশ্যং রসবলিতলাস্যং বিদধতো
স্তয়ো র্বক্রে যুঞ্জে নটনপটুবীটীং সখি মুহুঃ॥

(১১)

সদক্ষক্রীড়ানাং বিধিমিহ তথা শিক্ষয়তু সা
সুদেবী মে দিব্যং সদসি সুদৃশাং গোকুলভুবাং।

তয়োর্দ্বন্দ্বে খেলামথ বিদধতোঃ স্ফূর্জ্জতি যথা
করোমি শ্রীনাথাং সখি বিজয়িনীং নেত্রকথনৈঃ ॥

(১২)

রহঃ কীরদ্বারাপ্যতিবিষমগূঢ়ার্থরচনং
দলে পাদ্মে পদ্যং প্রহিত মুদয়চ্চাটু হরিণা।
সমগ্রং বিজ্ঞায়াচলপতি বলংকন্দরপদে
তদভ্যর্ণে নেষ্যে দ্রুতমতি মদীশাং নিশিকদা ॥

(১৩)

অদভ্রং বিভ্রাণৌ স্মরবণভবং কন্দরথলে
মিথো জেতুং বিদ্ধাবপি নিশিত নেত্রাঞ্চলশরৈঃ।
অপি ক্লিন্দোদ্গাত্রৌ নখদশন শস্ত্রৈরপিদরা
ত্যজন্তৌ দ্রষ্টুং তৌ কিমু তমসি বৎস্যামি সময়ে ॥

(১৪)

সমানং নির্ব্বাহ্য স্মরসদসি সংগ্রামমতুলং
তদাজ্ঞাতঃ স্থিত্বা মিলিততনু নিদ্রাং গতবতোঃ।
তয়োর্যুগ্মং যুক্ত্যা ত্বরিতমভিসঙ্গম্য কুতুকাৎ
কদাহং সেবিষ্যে সখি কুসুমপুঞ্জব্যজনভাক্ ॥

(১৫)

মুদা কুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরনিকরে পুষ্পশয়নং
বিধায়াবান্মালা ঘুস্থণ মধুবীটীবিরচনম্।
পুনঃ কর্ত্তুং তস্মিন্ স্মরবিলসিতান্যেৎকমনসো
স্তয়োস্তোষায়ালং বিধুমুখি বিধাস্যামি কিমহম্ ॥

(১৬)

জিতোন্মীলন্নীলোৎপলরুচিনি কান্তোরসি হরে
নিকুঞ্জে নিদ্রাণাং দ্যুতিগমিত গাঙ্গেয়গুরুতাম্।
কদা দৃষ্ট্বা রাধাং নভসি নবমেঘে স্থিরতয়া
বলদ্বিদ্যুল্লক্ষ্যাং মুহুরিহ দধে থুৎকৃতিমহম্ ॥

(১৭)

বিলাসে বিস্মৃত্য স্খলিতমুকুরঙ্গে র্মণিসরং
ক্রুতং ভৃত্যাগত্য প্রিয়তম সখী সংসদি হ্রিয়া।
তমানেতুং স্মিত্বা তদবিদিতনেত্রান্ত নটনৈঃ
কদা শ্রীমন্নাথা স্বজনমচিরাৎ প্রেরয়তি মাম্॥

(১৮)

ক্বচিৎ পদ্মা শৈব্যাদিকবলিত চন্দ্রাবলিমুক
প্রিয়ালাপোল্লাসৈরতুলবপি ধিন্বন্নঘহরঃ।
কদা বা মৎপ্রেক্ষালবকলিত বৈলক্ষ্যভরতঃ
ক রাধত্যাজল্পন্মলিনয়তি সর্ব্বাঃ পরমিমাঃ॥

(১৯)

সগর্ব্বাঃ সংরুদ্ধ্য প্রখর ললিতাদ্যাঃ সহচরী-
স্ততো দানং দর্পাৎ সখি মৃগয়তা স্বং গিরিভৃতা।
বিশাখা মন্নাথানয়ননটনপ্রেরণবলা-
দ্বিধৃত্যারান্নীতা রুষমিহ দধানা ক্ষিপতু নঃ॥

(২০)

স্তনৌ শৈলপ্রায়াবপি তব নিতম্বো বথসনঃ
স্ফুটং জীর্ণা নৌ স্মে কলয় তটিনীং বাতবিষমাম্।
কথং পারং গচ্ছেরিহ নিবস রাত্রাবিতি হরে-
র্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাধা কপট কুপিতা স্মেরয়তু মাম্॥

(২১ (

ইদং স্বান্তে ভুঙ্ক্তে কদলমপি যদ্রঙ্গণলতা-
'ভৈধেক স্বর্বল্লীপবন লভনেনৈব ফলিতম্।
তদভ্যাসে স্ফূর্জ্জন্মদনসুভগং তদ্যুবযুগং
বিজয্যে সোল্লাসং প্রিয়জনগণৈ রিথমিহ কিম্॥

ইতি স্বসঙ্কল্পপ্রকাশাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অথ নবাষ্টকম্।

(১)

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর প্রাণাধিক প্রেয়সীং
স্বীয়প্রাণপরার্দ্ধপুষ্পপটলী নির্ম্মঞ্ছ্য তৎপদ্ধতিম্।
প্রেম্না প্রাণবয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥

(২)

স্বীয়প্রেষ্ঠ সরোবরান্তিকবলৎ কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ
ফুল্লৎ পুষ্পমরন্দলুব্ধমধুপ শ্রেণীধ্বনি ভ্রাজিতে।
মাদ্যন্মন্মথরাজ্যকার্য্যমসকৃৎ সন্তালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥

(৩)

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গতুঙ্গিততরানঙ্গাসুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যালঙ্গিম সঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ।
ফুল্লৎ স্মেরসখীনিকায়নিহিত স্বাশীঃ সুধাস্বাদন-
লব্ধোন্মাদধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥

(৪)

জিত্বা পাশককেলি সঙ্গরভরে নির্ব্বাদবিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ গর্ব্বোদ্ধুরে।
ঈষৎ শোণদৃগন্তকোণহৃদয় দ্রোমাঞ্চ কম্পস্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥

(৫)

অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নবকাননশ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্।
প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণংপ্রিয়
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদা ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ ॥

(৬)

মিথ্যা স্বাপমনল্প পুষ্পশয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা-
মধ্যে প্রাগদধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্।
স্মিত্বা তেন গৃহীতকণ্ঠ নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিতস্তনীং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥

(৭)

তূর্ণং গাঃ পুরতোবিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণাদ্ যৌবত কাঙ্ক্ষিতাক্ষিনটনৈঃ পশ্যন্তমস্যামুখম্।
শ্যামংশ্যামদৃগন্তবিভ্রমভরৈ রান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মাম্লানি করোদয়া ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥

(৮)

প্রোদ্যৎকান্তিভরেণ বল্লভবধূ তারাঃ পরার্দ্ধাৎপরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জলরসেরাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারণ্যবরেণ্য ধন্যগগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দুবিরাজিতাং ভজ মনো রাধামগাধাং রসৈঃ॥

(৯)

প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতি র্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্কা গদ্গদনিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেৎ যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্তমুকুন্দ ভৃঙ্গবিলস দ্রাধাসুধাবল্লরীং
সেবোদ্রেক রসেন.গোষ্ঠবিপিনে প্রেম্না সতাং সিঞ্চতি।

ইতি নবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।*

---

* উদ্ধৃত স্তোত্রগুলির বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

—০০—

শ্রীশ্রীব্রজলীলায় প্রবেশ।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ব্রজলীলা পরিকরের অন্তর্ভুক্তা শ্রীমতী রতিমঞ্জরী। শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে ইহার আরও দুইটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তি শ্রীমতী রতিমঞ্জরীম্
ভানুমত্যাখ্যাকাং কেচিৎ আহুস্তন্নামভেদতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর পূর্ব্বাখ্যা (ব্রজলীলা পরিকরাখ্যা) শ্রীরসমঞ্জরী। কেহ কেহ ইহাকে শ্রীমতী রতিমঞ্জরী বলিয়াও অভিহিত করেন। আবার কেহ কেহ ইহাঁকে ভানুমতী আখ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন। রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা পরিকর-দেহ অপ্রকট করিয়া কি প্রকারে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিলেন, তাহা সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের অনুমেয়। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাধমের পক্ষে সেই অচিন্ত্য ভাবরাজ্যের লীলাবিলাস বর্ণন একবারেই অসম্ভব। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ রঘুনাথের অন্ত্যচরিতের যে দুই একটী ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী অন্ত্যদশায় শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণসহ মধ্যে মধ্যে চকিতের ন্যায় দেখিতে পাইতেন। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু আর দেখিতে না পাইয়া অমনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

তিনি স্বীয় বিরচিত শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রের উপক্রমে লিখিয়াছেন :—

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবন-মহেশ্বরীং।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতি র্দাস্যতিকাতরা॥
পতিতা তৎসরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরবাকুলা।
তচ্ছ্রীবক্ত্রেক্ষণাব্যাপ্ত্যৈ র্নামান্যেতানি সংজগৌ॥

অর্থাৎ "শ্রীরাধার পাদপদ্মমাত্রাশ্রয়া জনৈক দাসী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে দেখিতে না পাইনা রাধাকুণ্ডতীরে পতিতা হইয়া অতীব ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্রমা দর্শন করার নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ নামসকল কীর্ত্তন করিয়াছিল।"

শ্রীরাধিকার চরণান্তিকে স্থান প্রাপ্তির জন্য শ্রীমদ্দাস গোস্বামী কি-প্রকার ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেন, বিলাপ কুসুমাঞ্জলির নিম্নলিখিত শ্লোকটীও তাহার কিঞ্চিৎ ভাবপ্রকাশক :-

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবী ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্॥

"শ্রীরাধে, বৃন্দাবনেশ্বরি, আমি তোমার দাসী, তোমারই দাসী, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুমি আমার জীবিতেশ্বরী, তোমার চরণ না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও-যে প্রাণ রাখিতে পারি না, ইহাই জানিয়া আমাকে অচিরে চরণান্তিকে স্থান দাও।"

দয়াময়ী বৃন্দাবনেশ্বরী অচিরেই তাঁহার প্রিয়তমা দাসীর অভিষ্ট পূর্ণ করিলেন। শালিবাহনের পঞ্চদশ শকের অন্তে কয়েক বৎসর গত হইলে আশ্বিন মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরঘুনাথের দেহ তদীয় ভক্তগণের নিকট চিরনিস্পন্দ বলিয়া অনুমিত হইল,—যে রসনা মন্দ মন্দ নড়িতেছিল, তাহা আর নড়িল না, নেত্রের বিরহ-অশ্রু শেষবারের জন্য আনন্দাশ্রুতে মিশিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের শেষক্রিয়া একবারে নিরুদ্ধ হইল। শ্রীমুখমণ্ডল এক অলৌকিক উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, সহসা সুধাজ্যোৎস্নায় চারিদিক অলৌকিক ভাবে বিভাসিত হইয়া উঠিল, বৃন্দাবনের সকল মাধুরিমাই যেন যুগপৎ প্রকাশিত হইল। অনির্ব্বচনীয় শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্য দিয়া শ্রীরতিমঞ্জরীকে সঙ্গে লইয়া

প্রেমময়ী যেন অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি প্রভৃতি তখন দারুণ বিরহে বিমূর্চ্ছিত হইলেন। *

শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথরূপ প্রকট দেহে শ্রীগৌর লীলায় এতকাল বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আবার ব্রজলীলা-পরিকর-রূপ প্রাপ্ত হইলেন।

---

* শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর তিরোধানের বর্ণন তৎসাময়িক প্রাচীন প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তদ্‌রচিত স্বনিয়ম দশকে তিনি তদীয় তিরোধান সম্বন্ধে একটী মনোগত কথা লিখিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশনবসনপাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নিবাহ্য ব্যবহৃত মদম্ভং সনিয়মং।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যেতু প্রষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ॥

শ্রীজীব গোস্বামি প্রভৃতির সম্মুখে যেন তাঁহার তিরোধান হয় ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। এখানে "জীবাদি" বলিতে কাহাকে কাহাকে বুঝায় এই কথা বিবেচ্য। শ্রীজীব, শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল কবিরাজ ও শ্রীল দাস ব্রজবাসী প্রভৃতিই "জীবাদি" পদের বাচ্য হইতে পারে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন; বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির শোকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর পূর্ব্বেই তাঁহার সম্মুখে কবিরাজের তিরোভাব ঘটে, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট শোক প্রকাশ করেন।

বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস।
মরমে রহল শেল না পূরিল আশ॥
তুমি গেলে আর কেবা আছয়ে আমার।
করুণি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তার॥
————তাহা করিতে ভাবন।
মুদ্রিত নয়নে প্রাণ কৈল নিক্রামণ॥

কিন্তু শ্রীমদ্ যদুনাথ দাস প্রেমবিলাসের এই উক্তিতে সন্দেহ

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর শ্রীগৌরলীলা-পরিকর-দেহ-অপ্রাকট্যের নিদর্শন-স্বরূপ সমাধি এখনও বর্ত্তমান। শ্রীমৎ রঘুনাথের নিভৃত নির্জ্জন "ঘেরায" এখনও দুই এক মূর্ত্তি বৈষ্ণব প্রতি দিবস তাঁহার সেই প্রেমভক্তিপ্রদ নাম উচ্চারণ করিয়া সেই পবিত্র ভূমি নয়ন-সলিলে পরিসিক্ত করেন।

ভজনের আদর্শ।

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের প্রিয়তম শিষ্য, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রেমভক্তিময় পুণ্যচরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় আমাদের অনুভব হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায়, শ্রীপাদ স্বরূপের অনুগ্রহে এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপের শিক্ষামৃতে

করেন। তিনি কর্ণামৃতে ইহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সন্দেহের কারণ এই যে কবিরাজ লিখিয়াছেন "ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাসঃ" ইহাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় শ্রীমদ্দাস গোস্বামী কবিরাজের অগ্রেই তিরোহিত হয়েন। তবে প্রেমবিলাসের একরূপ লিখিত হইল কেন? তিনি শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকট এই সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীমতী ঠাকুরাণী যেরূপ শুনিয়াছিলেন তদনুসারে তিনি বলেন, "কবিরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্রূপ সিদ্ধদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া ছিলেন আচিরেই গ্রন্থ পাওয়া যাইবে। তাহাতে কবিরাজ পুনর্জ্জীবিত হইলেন।" বিশেষতঃ রঘুনাথের বাসনা ব্যর্থ হইবার নহে সুতরাং কবিরাজের অগ্রেই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর তিরোধান ঘটে ইহাই কর্ণামৃতের সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর আবির্ভাবের ও তিরোভাবের শকাদির নিশ্চয়াত্মক প্রমাণাভাব। বৈষ্ণবদিগ্দর্শিনী নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ ভাবে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব তিরোভাবের শকাদির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও আনুমানিক। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ন্যূনাধিক শত বৎসর কাল এই ধরাধামে প্রকট ছিলেন।

শ্রীরঘুনাথ মূর্ত্তিমতী সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপেই যেন প্রকটলীলায় প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসী রসিকেন্দ্র শ্রীপাদ স্বরূপ ব্রজলীলার ললিতা সখী। রঘুনাথ শ্রীরতিমঞ্জরী। ইনি ললিতার অনুগতা। স্বরচিত স্তবেও ইনি স্পষ্টতঃ ললিতার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, যথা :—

নানাবিধৈর্ব্যাকুল কাকুভৈরৈরসহ্যৈঃ
সংপ্রার্থিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন।
ত্বন্মানভঙ্গবিধয়ে সদয়ে জনোঽয়ং
ব্যগ্রঃপতিষ্যতি কদা ললিতাপদান্তে॥

বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তব

দয়াময়ি, রাধে,

ভাঙ্গিতে তোমার মান, তোমারি বধুয়া শ্যাম,
তব মুখচন্দ্রের চকোর :—
বিরহের হাহুতাশে, আসিবেন মম পাশে,
নয়নে বহিবে শত লোর॥
কাঁদিয়ে আকুল হবি, বলিবেন "মরি মরি,
না হেরিয়া রাধার বদন।
বিনা অপরাধে রাই, ত্যজিলেন মোরে তাই,
আসিয়াছি তোমার সদন॥
কে আছে গোকুল মাঝে, যাব আর কার কাছে,
কে আমারে করিবে বা দয়া।
বিরহে তাপিত প্রাণ, সদা করে আনচান,
কে মিলাবে রাধাপদছায়া॥
রাধাপদ সুধারাশি, তুমি সে চরণ দাসী,
মিলালে মিলাতে পার তাঁরে।"
শুনিয়ে শ্যামের কথা, পাইয়ে দারুণ ব্যথা,
ললিতা চরণে যাব প'ড়ে॥

শ্রীরতিমঞ্জরী ললিতার অনুগতা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই রঘুনাথ-রূপ

রতিমঞ্জরীকে তদীয় চরণান্তিকে পাওয়া মাত্রই শ্রীল স্বরূপ-রূপ ললিতার নিকটে সমর্পণ করেন। বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তোত্রেও শ্রীমদ্দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর এই দয়ার কথা স্পষ্টতঃই লিখিয়া রাখিয়াছেন যথা :—

যো মাং দুস্তরগেহ নির্জ্জন মহাকূপাদপারক্লমাৎ।
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ॥
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তংপ্রপাদ্য স্বয়ম্।
শ্রীদামোদরস্যাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥

উপসখী শ্রীরতিমঞ্জরী কোটি কোটি সাধক ভক্তের কুঞ্জসেবাধিকার প্রদানের কর্ত্রীস্বরূপিণী। শ্রীরঘুনাথরূপা রতিমঞ্জরী বুঝি বা কলির জীবদিগের সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির ভজন প্রদর্শন করিতেই প্রকট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবমাত্রেরই তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া ভজনমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই পথে অধঃপতনের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা নাই। এই পথ কঠোর হইলেও বিভীষিকা-বা-আশঙ্কালেশ পরিশূন্য ও নিত্য আলোকে আলোকিত। অনেকেই ভজনের কুসুমকোমল পথের অন্বেষণ করিয়া অবশেষে পাপ-কণ্টকাকীর্ণ ও অপরাধ-শ্বাপদপূর্ণ ভীষণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। মোহের কুহক-আলোকে নরকের পথ আপাততঃ রমণীয় হইলেও উহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, প্রেমের নামে কাম,—এ জগতের সহজ রীতি। সুতরাং বৈষ্ণব সাধক মাত্রেই যেন শ্রীমদ্ রঘুনাথের নখচন্দ্রের বিমল জ্যোতিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভজনপথেব অনুসরণ করেন। তাঁহার ভজনরীতি সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বসজ্জন সম্মত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধুজন মাত্রেরই সমাদৃত। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন সকলেই শ্রীমদ রঘুনাথের বৈরাগ্য আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ সর্ব্বসাধকেব আদর্শস্বরূপ।

এই ভজনাদর্শ মহাপুরুষের পুণ্যচরিত্র চিত্রিত করা এই সাধন-ভজনবিহীন অধম লেখকের সামর্থ্যায়ত্ত নহে। এ অধম শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীচরণে অনন্ত কোটীবার প্রণত হইয়া কেবল ইহাই প্রার্থনা করিতেছে যে, হে মহাপুরুষ, আপনি বৈষ্ণব জগতে বিশুদ্ধ ভজনপ্রণালী বিস্তার করুন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর গ্রন্থাবলী।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহার ভুবনপাবন শ্রীচরিত্র রহিয়াছেন,—আর রহিয়াছেন, তৎপ্রণীত শ্রীগ্রন্থ ও স্তোত্ররাজি। শ্রীদান-চরিত, শ্রীমুক্তাচরিত ও স্তবমালা এই তিনখানি গ্রন্থের নাম সর্ব্বজন বিদিত। স্তবমালা স্তবাবলী নামে খ্যাত, যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর কৃত স্তবমালার সহিত পার্থক্য-সূচনের জন্যই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্তবমালা স্তবাবলী নামে খ্যাত হয়। এই স্তবমালা ভক্তজনের কণ্ঠহার। মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধক ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনদ্যুতিমতী অত্যুজ্জ্বল স্তবমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। এই স্তবমালায় ২৯টী স্তব আছেন, এ স্থলে ইহাদের নামোল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

(১) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্. (২) শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষঃ, (৩) মনঃ-শিক্ষা, (৪) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা, (৫) শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্, (৬) শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা দশকম্, (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (৮) ব্রজবিলাস স্তবঃ, (৯) বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ, (১০) প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্রম্, (১১) গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা, (১২) স্বনিয়ম দশকম্, (১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম, (১৪) শ্রীরাধিকাষ্টকম্, (১৫) প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজঃ, (১৬) স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্রম্. (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-কুসুমকেলিঃ, (১৮) প্রার্থনামৃতম্, (১৯) নবাষ্টকম্, (২০) গোপালরাজ স্তোত্রম্, (২১) শ্রীমদনগোপাল স্তোত্রম্, (২২) শ্রীবিশাখানন্দদাভিধ-স্তোত্রম্, (২৩) শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, (২৪) উৎকণ্ঠাদশকম্, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্ব দৃদিক্ষাষ্টকম্, (২৬) অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টকম্, (২৭) দান নিবর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকম্, (২৯) অভীষ্টসূচনম্। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্দাস গোস্বামী সময়ে সময়ে বাঙ্গালা পদও রচনা করিতেন। বাঙ্গালা পদগুলির অনেক পদই হয়তো এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু হইতে

তিনটী পদের এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। নিম্নলিখিত পদটী শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনা :—

"চন্দ্রবদনী ধনী, মৃগ-নয়নী।
রূপেগুণে অনুপমা, রমণী-মণি ॥
মধুরিম-হাসিনী, কমল বিকাসিনী,
মতিম-হারিণী, কম্বুকণ্ঠিনী।
ধীর সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি,
তনুরুচি ধারিণী, পিক-বয়ানী ॥
উজর লম্বিত বেণী, মেরুপর যেন ফণী,
আভরণ বহু মণি গজগামিনী।
বীণা পরিবাদিনী, চরণে নুপুরধ্বনি,
রতিবসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥
সিংহজিনি মাজাক্ষীণী, তাহে মণিকিঙ্কিনী,
কাঁপি উছলি তনুপদঅবণী।
বৃষভানু-নন্দিনী, জগজন বন্দিনী,
দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিণী ॥"

নিম্নলিখিত পদটীতে আরত্রিক বর্ণনা করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এই পদটী গীত হইতেও শুনিয়াছি। এটী যেমন মধুর, তেমন স্বাভাবিক, তেমনই উজ্জ্বল ভক্তিরসের উদ্দীপক।

"হরল সকল সন্তাপ, জনমকো মিটত,
তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদনগোপাল কি ॥ ধ্রু ॥
গোঘৃত বচিত, কর্পূর কি বাতি,
ছলকত কাঞ্চন থাল কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ, ঝাঝরী বাজত,
বেণু বিশাল কি ॥
চন্দ্র কোটী জ্যোতি, ভানু কোটী রশ্মি,
মুখ শোভা নন্দলাল কি।

ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
উরে বৈজয়ন্তী মাল কি ॥
সুন্দর লাল, কপোল ছবি মো,
নিরখত মদনগোপাল কি ॥
সুরনর মুনিগণ, করতহি আরতি,
ভক্তবৎসল প্রতিপাল কি ॥
ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
অঞ্জলি কুসুম গোপাল কি।
বন্দিছে রঘু- নাথ দাস, পহু,
মোহন গোকুল বাল কি ॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ নীলাচল বাসের সময়ে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার প্রভুপাদ শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ গান করিতেছেন, রায় রামানন্দ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন, আর মহাপ্রভু অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন। নীলাচলবাসীর নিকট শ্রীজয়দেবের সঙ্গীত অতি প্রিয় পদার্থ, এখনও জয়দেবের গানে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতি সম্পাদন করা হয়। শ্রীমদ্ রঘুনাথ অতি অল্পাক্ষরে অথচ কয়েকটী সুনির্বাচিত বহু অর্থবোধক শব্দে জয়দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্‌যথা ঃ--

পদ্মাবতী রতিকান্ত।
রাধামাধব, প্রেমভকতি রস,
উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ, নিগূঢ় লীলা গুণ,
পদ্মাবলী পদবৃন্দ ॥
কেন্দু বিল্ববর, ধাম মনোহর,
অনুক্ষণ করয়ে বিলাস।
রসিক ভক্তগণ, সে সরবস ধন,
অহর্নিশি রহু তছু পাশ ॥

যুগল বিলাস গুণ, করু আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
কিয়ে করব নব ওর॥"

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর প্রেমোজ্জ্বল ভজন-রীতি তদীয় গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিরাজিত। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চরিত্র-চিন্তা ও ভক্তি সহকারে তদীয় গ্রন্থ-পাঠ সাধক-বৈষ্ণবের ভজনের পরম সহায়।

অপরাধভঞ্জন-প্রার্থনা।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অপার গম্ভীর চরিতামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করা হইল না, যাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল, তাহাতেও অনেক প্রকার ত্রুটি, ভ্রমপ্রমাদ, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসাদি দোষ থাকিতে পারে। ভরসা আছে, অদোষদর্শী সহৃদয় বৈষ্ণবসজ্জনগণ আমাকে সে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন। এই ভজন-সাধন-বিহীন জন এই গ্রন্থে কেবল শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াই আত্মশোধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাঁহার মহাভক্তিপ্রদ নাম বৈষ্ণবমাত্রেরই সতত স্মরণীয়। ফলতঃ শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোস্বামীর কৃপাতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাঁদের স্মরণ-মঙ্গল নাম বৈষ্ণব-মাত্রেরই উচ্চার্য্য। ভজননিষ্ঠ কোন প্রাচীন সুপণ্ডিত ভক্ত এক স্তবে কি প্রকারে ছয় গোস্বামীর শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে সেই ভুবনপাবন স্তবরাজের উল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

(১)

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনমগ্ন-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী,
ধীরাধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।

শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(২)

নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ,
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দভজানন্দেন মত্তালিকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(৩)

শ্রীগোবিন্দগুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধান্বিতৌ,
পাপোত্তাপকুলোদ্ভবাং তনুভৃতাং গৌরাঙ্গগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনৈকরসিকৌ কৈবল্যনিস্তারকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(৪)

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীমতাং তন্মহ',
সর্ব্বার্থাদিগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নৌ মুহুঃ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(৫)

কূজৎকোকিলহংসসারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে,
নানারত্ননিবদ্ধমূলবিটপ শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবান্বিতৌ যৌ মুদা,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(৬)

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে,
প্রেমোন্মাদবশাদশেষদশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
ধ্যায়ন্তৌ চ কদা হরেগুণবরম্ ভাবাভিভূতৌ মুদা,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(৭)

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ,
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জিহ্বৌকৃতৌ যৌ মুদা,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥

(৮)

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ,
শ্রীগোবর্দ্ধনকল্পপাদপতলে কালিন্দি বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে স্বেদৈর্মহাবিহ্বলৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥

শ্রীমদ্ দাসগোস্বামীর চরিতবর্ণন-রূপ-দুঃসাহসে যে অপরাধ ঘটিয়াছে, এই স্তবরাজ এই অধম লেখকের সেই অপরাধ ভঞ্জন করুন।

পরিশিষ্ট।

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর রচিত যে কতিপয় সংস্কৃত স্তোত্র এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় সেই সকল স্তোত্রের ভাবার্থ প্রকাশ করাই এই পরিশিষ্টের বিষয়। রঘুনাথের ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠধ্বনি অনেক কাল হইল নীরব হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচিত স্তোত্ররাজি এখনও ভক্ত বৈষ্ণব গণের মধুর কণ্ঠে উদ্গীত হইয়া থাকে। স্তবপাঠ বৈষ্ণবের উপাসনার অন্তর্গত। বন্দনা নববিধ ভক্তির একতম। জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এইরূপ বন্দনা-পাঠ বা প্রার্থনার রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রার্থনাই আমাদের আত্মার শান্তি, চিত্তবৃত্তির বিশ্রান্তি, এবং স্মৃতির সাম্যভাব, এই প্রার্থনাই ধ্যানের আধার উদ্বেগের বিরাম এবং আমাদের জীবনঝটিকার শান্তিবিধায়িনী শান্তি, প্রার্থনাই চিন্তাহীন এবং প্রসন্ন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় অফুরন্ত উৎস*। বৈষ্ণবভজনে প্রার্থনা পরম সহায়। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে শ্রীমদ্দাস গোস্বামি বিরচিত চিত্তপ্রসাদক ও প্রেমভক্তিপ্রদ কতিপয় স্তোত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পরিশিষ্টে ঐ সকল স্তোত্রের ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না থাকিলেও ইহাতে ভাবগত অনুবাদের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষ, শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় দশক, শ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশক, শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক, শ্রীরাধিকাষ্টক, প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ, উৎকণ্ঠাদশক, প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশক, অভীষ্টপ্রার্থনা

* পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত জেরেমী টেলার লিখিয়াছেন :—

"Prayer is the peace of our spirit, the stillness of our thoughts, the evenness of recollection, the seat of meditation, the rest of our cares, and the calm of our tempest; prayer ue of a quiet mind, of untroubled thoughts

ষ্টক, প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্র, অভীষ্টসূচন-স্তোত্র, স্বসঙ্কল্প প্রকাশ স্তোত্র, নবা-ষ্টক, এই কয়েকটী স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীশচীনন্দনাষ্টক ও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ প্রাচীন পদ্যানুবাদ সহ মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত হইযাছে। সুতরাং পরিশিষ্টে বাহুল্য ভয়ে এই দুইটী স্তবের পৃথক অনুবাদ দেওয়া গেল না। শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক হইতে অবশিষ্ট স্তোত্রগুলির যথাক্রমে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইল। এই বঙ্গানুবাদগুলির অধিকাংশ স্থলই স্তবাবলীর প্রাচীন টীকাকার ৺বঙ্গবিহারি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিবৃতির অভিপ্রায় অনুসারে লিখিত হইযাছে।

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় দশক।

ইন্দ্রের ক্রোধে সপ্তাহকাল গোকুলে অতিবৃষ্টি প্রভৃতি যে ভীষণ দৈব উৎপাত ঘটে, সেই সময়ে যিনি মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণ-করকমলের কনিষ্ঠাঙ্গুলি রূপ পদ্মবীজকোষে মুগ্ধ ভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র-রূপ কুম্ভীরের কবাল কবল হইতে ব্রজভূমিকে রক্ষা করিয়াছিলেন,* সেই গোকুলবান্ধব গিরিবরের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ১।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলেন ইহা জানিয়া, ইন্দ্রের অনুগতা সুরভি গঙ্গাজলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণই গো-গণের কর্ত্তা" ইহাই স্থির করিয়া তাহাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করিলেন। যাহার নিকটে সর্ব্বজননয়নানন্দ শ্যামকুণ্ড উপভোগ্য হইলেন, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান সেই গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ২।

* এই পদ্যে দুইটী অলঙ্কার আছে। একটী রূপকালঙ্কার,—গোবর্দ্ধনকে ভ্রমররূপে এবং শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে সেই ভ্রমরের আশ্রয়-স্বরূপ পদ্মবীজকোষরূপে আরোপিত করা হইয়াছে। এইটী রূপক অলঙ্কার।

অতঃপরে ব্যতিরেক অলঙ্কার প্রদর্শিত হইতেছে। সরোবরে পদ্ম-কোষস্থ মুগ্ধ ভ্রমর, কুম্ভীরগ্রস্তজনকে রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু এস্থলে

গঙ্গাদিবরেণ্য তীর্থগণ হইতেও যে গোবর্দ্ধন ভক্তজনহৃদ্য; শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ব্রহ্মা হর ও অপ্সরাগণের প্রীতিদায়ক এবং ভক্তি-মঙ্গল-কান্তি-দায়ক শ্রীদানকুণ্ডাদি যাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান, মহামান্য মুনিবর শুকদেবও যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতীর আশ্রয়ণীয় নহে? ৩।

যে গোবর্দ্ধনগিরির চতুর্দ্দিকে, জ্যোৎস্নামোক্ষণ সরোবর, মাল্যহার সরোবর, সুমনস্ সরোবর, গৌরী সরোবর, বলারিধ্বজ সরোবর এবং গন্ধর্ব্ব সরোবর প্রভৃতি বিরাজিত, যাঁহার পার্শ্বে নির্ঝরগিরি বিরাজমান, স্বয়ং ভগবানও যেখানে গোপালরূপে বিহার করেন, যে গোবর্দ্ধন শৃঙ্গাররসের সিংহাসনস্বরূপ সেই গোমৃগপক্ষি প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ৪।

গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ মহাদেব অপেক্ষাও অধিকতর ভক্তিমান্। শিব আপন শিরে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জটা-কলাপে জাহ্নবী প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যোম-কেশের মস্তক অবনত হয় নাই, অথবা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী জাহ্নবীর প্রতি ভক্তিপরবশভাবেও তিনি তাঁহাকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন নাই। ভগীরথের প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হইয়াই মহাদেব গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন ভক্তিভরে অবনত মস্তকে

দেখা যাইতেছে, গোবর্দ্ধনরূপ ভ্রমর ইন্দ্ররূপ কুম্ভীরের কবল হইতে ব্রজ-ভূমির রক্ষাসাধন করিয়াছেন।

রূপক অলঙ্কারের লক্ষণ :—

বিষয্যভেদতাদ্রূপ্যরঞ্জনং বিষয়শ্চ যৎ।
রূপকং তৎত্রিধাধিক্য ন্যূনত্বানুভয়োক্তিভিঃ॥

ব্যতিরেক অলঙ্কারের লক্ষণ :—

ব্যতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপমানয়োঃ।

এই ব্যতিরেক অলঙ্কার দ্বারা গোবর্দ্ধনের অলৌকিক শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্যমণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করেন। সুতরাং ইনি শিব হইতেও অধিকতর ভক্ত এবং ভক্তমাত্রেরই স্বব্যতম।। এতাদৃশ গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ৫।

মানসগঙ্গা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলী স্থান। এই মানসগঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ নাবিকবেশে শ্রীমতীকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া তরঙ্গময় মধ্যনদীতে নৌকা কম্পনে ভীতা করিলেন, ভয়বিহ্বলা রাধিকা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মুখচুম্বনাদি দ্বারা নিজের অভীষ্ট পণ গ্রহণ করিলেন। এই নৌলীলার রঙ্গস্থলী মানসগঙ্গা যে গোবর্দ্ধনে বিরাজমানা, নবদম্পতীর মধ্যাস্পদরূপ সেই গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ৬।

যে গোবর্দ্ধনে রাসস্থবাসে শতলক্ষ্মীবন্দনীয়া সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভান্বিত বাহুবিজড়িত কণ্ঠে শ্রীমতী রাধিকা রাস-নৃত্যে প্রমত্তা হয়েন, সেই দ্বিতীয় রাসস্থলী স্বরূপ অত্যুন্নত গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ৭।

যে গোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সখীগণ নবদম্পতীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ-তর, ইহাই লইয়া বিক্রমসূচক কলহ করেন, অর্থাৎ মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনের রাজা, সুতরাং তোমরা তাঁহার প্রজা"। ললিতা বলিলেন "নিসর্গ ব্রাহ্মণ তুমি অজ্ঞ, কে রাজা তাহা তুমি জান না, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীই এই বৃন্দাবনের রাজ্ঞী, তোমরা তাঁহারই আশ্রিত।" এইরূপ বাক্যকলহে যে স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হয়েন এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্যে ও কুটিলতর অপাঙ্গ চাহনিরূপ বাণবর্ষণে উভয়েই আনন্দবিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের দানকেলীজনিত বাককলহ বর্দ্ধিত হয়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃথুকেলীসূচনশীল সেই গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে? ৮।

এই স্থলে উল্লাস অলঙ্কার লক্ষিত হয়। উহার লক্ষণ:—

একস্য গুণদোষাভ্যামুল্লাসোঽন্যস্য তৌ যদি।

অর্থাৎ একের দোষগুণবর্ণনে যদি অপরের দোষগুণের উল্লেখ করা হয়, তবে উহা উল্লাস অলঙ্কার।

যে স্থানে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও বলদেব সহ মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে সুমধুর "রী রী" স্বরে গান করেন, যাহার নিভৃতগুহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃ কেলীর রঙ্গস্থলী, এতাদৃশ সৌভাগ্যশালী গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে ? ৯।

ব্রজরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের অনেকেরই অর্চ্চনা করিতে পারিতেন। কালিন্দী সাক্ষাৎ সূর্য্যনন্দিনী। তাঁহার অর্চ্চনা করিলেও ব্রজভূমির রক্ষা হইতে পারিত। কেননা কালিন্দীতপনোদ্ভবা। "তপতি শোষয়তীতি তপনঃ", সূর্য্য স্বীয় কিরণে রস শোষণ করিয়া উহাই বৃষ্টির আকারে বর্ষণ করেন। মেঘ সূর্য্যেরই আজ্ঞাবহ। সুতরাং তনয়ার অর্চ্চনা করিলেও কন্যা-সেবনেই সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বর্ষণ নিবারণ করিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার শরণ গ্রহণ করিলেন না। তিনি অত্যুন্নত শৃঙ্গশালী গিরিগণের নিকটেও এ বিষয়ে সাহায্যার্থী হইলেন না। কল্পবৃক্ষস্বরূপ শ্রীবৃন্দারণ্য ব্রজবাসীদের সকল প্রকার অভীষ্ট, প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং বৃন্দারণ্য দ্বারাও বিঘ্ন নিবারণ সম্ভাবিত হইতে পারিত, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী হইলেন না, এমন কি নন্দীকেশ্বরও ব্রজবাসীজনের একান্ত সংপূজ্য এবং ব্রজজনের বাঞ্ছাকল্পতরু, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রজ রক্ষার প্রার্থী হইলেন না। এই সকল পরিত্যাগে শ্রীকৃষ্ণ যে গোবর্দ্ধনের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই গিরিকিরীটী গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ কে না করে ? ১০।

যাঁহার কৃপায় এই জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেও এই গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দর্শক প্রাদুর্ভূত হইল, এই দশক সেই উদয়শীলগুণবৃন্দের রম্য খনিস্বরূপ আমার জীবনোপায় শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয়ের সন্তোষ-বিধানে সমর্থ হউক, আমি এই ফলের প্রার্থনা করি।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি অতুলপৃথুল শৈলশ্রেণীর রাজা, তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডের অগ্রভাগে ছত্রের আকার ধারণ করিয়া মদমত্ত ও উদ্ধত ইন্দ্রের দর্প প্রতিহত করিয়াছ, তোমার নিকটে বাস করা আমার অতি প্রীতিকর, তুমি আমার এই বাসনা পূরণ কর। ১।

হে গোবর্দ্ধন, তোমার কন্দরে কন্দরে রাধাশ্যামের প্রমদমদনলীলার রঙ্গস্থলী। আমার প্রাণ সেই যুগলরূপ দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল। উঁহা-দের দর্শনলাভের পক্ষে তুমিই ঘটকস্বরূপ। তোমার নিকট বাস করা আমার অতি প্রীতিকর, তুমি আমার এই বাসনা পূরণ কর। ২।

হে গোবর্দ্ধন, তোমাতেস্থিত তরু, ঝোর, কন্দর, সানু (সমান প্রদেশ) দ্রোণি (অরণ্য প্রদেশ) প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্থানই কৃষ্ণলীলার মণিবেদীরত্নসিংহাসন। শ্রীকৃষ্ণ কুতকী সখীগণ সহ তোমার তরুতে, তোমার ঝোরে, তোমার সানুতে, তোমার কন্দরে, তোমার ঝোপের আড়ালে, দোলাদোলি লুকাচুরি প্রভৃতি কত লীলাই করেন। তোমার নিকটে বাস করিতে কত ভাল বাসি। তুমি আমার এই বাসনা পূরণ কর। ৩।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি রসনিধি রাধাকৃষ্ণের দানকেলীর সাক্ষিণীরূপা কান্তিমতী ও সুগন্ধি শ্যামবেদীর প্রকাশ করিয়া রসিকবর ভক্তকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ। তোমার নিকট বাস করা আমার একান্ত সাধ। হে গিরিবর, আমার এই বাসনা পুরণ কর। ৪।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি যেরূপ স্থানে তোমার প্রিয়তম সখা—রাধা-কুণ্ডকে,—কৌতুকে আলিঙ্গন করিয়া গুপ্তভাবে নির্জ্জনে রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিতেছ, আমাকে তোমার নিকটে তাদৃশ একটুকু নির্জ্জন স্থান প্রদান কর। ৫।

হে গোবর্দ্ধন তুমি যথার্থই গো-বর্দ্ধন। তুমি প্রতিপদেই স্থল, জল, তল, ঘাস ও বৃক্ষচ্ছায়াদি দ্বারা সর্ব্বদা গো-কুলের সুখ প্রদান করিতেছ, এবং ত্রিজগতে নিজের নাম সার্থক করিতেছ। (গাং বর্দ্ধয়তি শস্পাদিনা

পুষ্টয়তীতি গোবর্দ্ধনঃ) তোমার নিকট বাস করা আমার অতি প্রীতিকর. তুমি আমার এই বাসনা পূরণ কর। ৬।

হে গোবর্দ্ধন, ইন্দ্রের সপ্তাহকালব্যাপী নিদারুণ দ্রোহে অঘবকরিপু শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভ্যন্তর রূপ নবগৃহে ব্রজ রক্ষা করিয়া তোমার মান সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। তোমার নিকট বাস করা আমার প্রীতিকর। হে গোবর্দ্ধন আমার এই বাসনা পূরণ কর। ৭।

হে গিরিরাজ, শ্রীমতী রাধিকা তোমায় "হরিদাসশ্রেষ্ঠ" নামামৃতে অভিহিত করিয়াছেন। * সুতরাং হে বেদাভিহিত ব্রজললাটভূষণ, তোমার চরণান্তিকে আমায় একটুকু স্থান প্রদান কর। ৮।

হে গোবর্দ্ধন, সখীসহচরপরিবৃত রাধাকৃষ্ণের মৈত্রীরসাক্ত ব্রজবাসী মানুষ পশুপক্ষি প্রভৃতির তুমিই একমাত্র সুখদাতা। (শ্রীকৃষ্ণের কর-স্পর্শ মাত্রেই নিজের বিপুল দেহ উদ্ধৃত করিয়া সকলকে আপন বিবরে স্থান প্রদান করিয়া গোবর্দ্ধন দয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।) হে গোবর্দ্ধন, তোমার করুণা অনন্ত। আমি যদিও তোমার কৃপার যোগ্য নহি, কিন্তু তোমার কৃপার যথন্ন পার নাই, অতএব এ অধমকেও অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণান্তিকে একটুঃ বাসস্থান প্রদান কর। ৯।

হে গোবর্দ্ধন, তোমার নিকটে নিবাসদানে যদি যোগ্যাযোগ্যপাত্র-বিচারের আপত্তি থাকে, তবে এ স্থলে সে আপত্তির কোনও কারণ নাই। তোমার অতিপ্রিয় নির্হেতু-দয়াল শ্রীশচীনন্দন দ্বারা এই প্রতারক ও শঠ তোমার নিকটে অর্পিত হইয়াছে। প্রিয়জনের বাক্য প্রিয় সুহৃদের অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং আমার যোগ্যাযোগ্যতা বিচার না করিয়া তোমার শ্রীচরণান্তিকে আমায় অবশ্যই একটুকু স্থান প্রদান করিতে হইবে, ইহাই আমার প্রার্থনা। ১০।

* "হন্তায় মদ্রিরবলা! হরিদাসবর্য্য" শ্রীমদ্ভাগবতের এই পদ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীগোবর্দ্ধনকে হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভি-হিত করিয়াছেন।

ফলশ্রুতি।

যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের প্রতি ভক্তিরসপ্রদ এই দশকস্তোত্র যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তিনি সুখপ্রদ গোবর্দ্ধনবাস লাভ করিয়া অতি সত্বরেই যুগলপদসেবারূপ রত্ন প্রাপ্ত হন।

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক।

১। বৃষদনুজনাশের পর গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসকথোপকথনে শ্রীমতী স্বীয় নিখিল সখীসহ স্বহস্তে যে কুণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদচ্ছলে যে কুণ্ড প্রকটিত হয়েন সেই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

২। যিনি রাধাকুণ্ডে স্নান করেন, শ্রীকুণ্ড অতি শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে প্রেমরূপ কল্পবৃক্ষ উপজাত করিয়া দেন। এই প্রেমকল্পদ্রুম ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গের পক্ষেও সুলভ নহে। এই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৩। শ্রীকুণ্ডের মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব। যিনি অঘাসুরের উৎপাত হইতে ব্রজবালকগণের রক্ষা করিয়া সকল গোপগোপীর অতি শয় প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার প্রসন্নকটাক্ষ প্রাপ্তির কামনায় স্নানাবগাহন প্রভৃতি দ্বারা যে শ্রীকুণ্ডের সেবানুবন্ধ প্রদর্শন করেন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৪। ব্রজভুবনচন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণ যে কুণ্ডকে ব্রজকিশোরীগণের মাথার মণির ন্যায় প্রিয় বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে কুণ্ডকে শ্রীরাধাকুণ্ড নামে পরিচিত করিয়াছেন, সেই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৫। যে শ্রীকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অযোগ্য ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ কল্পলতায় পরিণত হয় এবং শ্রীরাধার দাস্যই যে প্রেমকল্পলতিকার প্রশংসনীয় পুষ্পরূপে গণ্য, সেই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৬। যে কুণ্ডের পূর্ব্বতটে চিত্রাসুখদ নিকুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদ নিকুঞ্জ, দক্ষিণে চম্পকলতা-সুখদ নিকুঞ্জ. নৈঋতে রঙ্গদেবীসুখদ, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাসুখদ, বায়ুকোণে সুদেবীসুখদ, উত্তরে ললিতানন্দদ এবং ঈশানকোণে বিশাখাসুখদ নামক উজ্জ্বলরসের উদ্দীপক এবং মধুকর নিকর করম্বিত নিকুঞ্জ সকল বিরাজমান, সেই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৭। যে কুণ্ডের তটস্থিত বেদীমঞ্চে সমাসীনা হইয়া আমার ঈশ্বরী প্রাণসমা সখীগণ সমভিব্যাহারে গোষ্ঠচন্দ্র শ্যামসুন্দরের সহিত মধুর হইতেও সুমধুর রসালাপ করেন সেই অতি মনোহর রাধাকুণ্ডই আমাব আশ্রয় হউন।

৮। সুপদ্মের সুরভি সৌরভে সুবাসিত প্রসন্ন সলিলপূর্ণ এবং প্রমত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত যে রাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রমত্ত ভাবে সুখ-রসে অনুদিন বিহার করেন, সেই অতি রমণীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।

৯। শ্রীরাধাব দাস্যে আত্মাকে উল্লাসিত ভাবে সমর্পণ করিয়া যিনি স্থিরচিত্তে এই চারু রাধাকুণ্ডাষ্টক মনোযোগ সহ পাঠ করেন, শ্রীকৃষ্ণ অতি আনন্দিত হইয়া ইহশরীরেই তাঁহাকে শ্রীমতীকে দেখাইয়া দেন।

শ্রীরাধিকাষ্টক।

১। যিনি হরিণনেত্রা সুরসিকা গোপীগণের শিরোমণির শোভা-স্বরূপিণী, যিনি প্রমুদিত প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসরোবরের মৃণালরূপিণী, যিনি ব্রজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বৃষভানুর পুণ্যরূপা কল্পলতিকাস্বরূপিণী, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

২। যাঁহার নিতম্ব অরুণ পট্টবস্ত্রে সুশোভিত এবং সেই নিতম্বের উপরিভাগস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা যাঁহার নৃত্য প্রকাশ করিতেছে। কুচযুগ বিলাসী মুক্তাহারে যাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশমানা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৩। যিনি উৎকৃষ্ট পদ্মকর্ণিকার ন্যায় নিরতিশয় কান্তিবিশিষ্ট, যাঁহার কৈশোরবয়ঃরূপ অমৃত নববিকাশমান তারুণ্যরূপকর্পূর মিশ্রিত, যাঁহার বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৪। কাননাগত অতি চপল ব্রজরাজনন্দনকে দেখিয়া যাঁহার নেত্র-দ্বয় শঙ্কাকুল, যিনি নেত্রভঙ্গীতে এবং সুমধুর মৃদুবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, সেই শ্রীরাধিকা স্বীয় দাস্যে কবে আমায় অভিষিক্ত করিবেন?

৫। যিনি নিখিল কুলব্রজমহিলাগণের প্রাণরূপিণী, যিনি নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর আত্মজতুল্য প্রেমপাত্রী ললিতার সুললিত আন্তরিক স্নেহে যাঁহার অন্তরাত্মা নিরন্তর প্রফুল্ল, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৬। যিনি এই বনের মধ্যে বিশাখা সখী সহ বিবিধ কুসুমচয়ন করিয়া বৈজয়ন্তী মালা রচনা করিতেছেন, যিনি সর্ব্বমঙ্গলের নিদান, যিনি সতত শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসর বক্ষে পরম প্রেয়সীরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৭। যিনি বেণুধ্বনি শুনিয়া কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে দ্রুতপদে গমন করেন, নিকটে গিয়া ঈষৎ নির্মিলিতনেত্রে সতৃষ্ণভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন এবং কর্ণ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে নতমুখী হয়েন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৮। অমলকমলরাজিস্পর্শি বায়ু দ্বারা সুশীতল শ্রীরাধাকুণ্ডে যিনি নিদাঘ সময়ের সায়াহ্নে পরমানন্দে সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করান, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন?

৯। যে বিমলচিত্ত ব্যক্তি নিখিল আশাপরম্পরা পরিহার করিয়া কাতরভাবে এই শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধার নিজগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেন।

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ।

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর রচিত যতগুলি স্তব আছেন, তন্মধ্যে কেবল এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তোত্রটীকেই "স্তবরাজ" নামে অভিহিত করা হই যাছে। মরন্দ শব্দের অর্থ পদ্মের মধু। তাহা হইলে "প্রেমাম্ভোজমরন্দ" শব্দের সহজ কথা "প্রেমের পদ্মমধু"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার যে আংশিক অনুবাদ আছে, এ স্থলে সর্ব্বাগ্রে তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।
প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এত কার্য্য তার
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ।
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ।
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম।
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান।
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি-কর্পূর এই তিন অঙ্গ বিলেপন॥

কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥
প্রচ্ছন্নমান বাম্য, —ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরা ধীরাত্মগুণ—অঙ্গে পটবাস॥
রাগ তাম্বুল রাগে—অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য —নেত্রযুগলে কজ্জল।
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।
সৌভাগ্য তিলকে- চারু ললাট উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন- হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়স সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখি আশপাশ।
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।
কৃষ্ণকে করান শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর।

এই অনুবাদ অতি অল্পাক্ষরে গ্রথিত, বিশেষতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীরাধার স্বরূপ ও ভূষণাদি বর্ণন করার নিমিত্তই প্রয়োজনানুযায়ী অংশ গ্রহণ করিয়া প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজের এই পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সবিস্তার ব্যাখ্যা ভিন্ন সাধারণ পাঠকগণ এই স্তবরাজের গূঢ় রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ। "শ্রীস্বরূপ দামোদর" গ্রন্থে শ্রীচরিতামৃতের এই পয়ারনিচয়ের অংশ

বিশেষের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ স্থলেও পুনর্ব্বার সেই প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীরাধিকা অঙ্গ প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত। শাস্ত্রকারগণ বলেন, শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী। মহাভাবময়ী মূর্ত্তি।—এই শ্রীমূর্ত্তি মেদমজ্জাস্থিসম্ভবা নহেন। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী বলিতেছেন ঃ-

"মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহা।"

"মহাভাব এব উজ্জ্বলং সকান্তিকং চিন্তারত্নং চিন্তামণি স্তেন উদ্ভাবিতো বিগ্রহো যস্যাঃ সাঃ।"

অর্থাৎ মহাভাবরূপ উজ্জ্বল চিন্তামণি দ্বারা উদ্ভাবিত বিগ্রহ যাঁহার, তিনিই মহাভাবোজ্জ্বল-চিন্তারত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহা। বিগ্রহ শব্দের অর্থ শ্রীমূর্ত্তি। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপ বিশেষরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বিগ্রহ। ইহার আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, তদ্‌যথা ঃ—

"মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নেন করণেন সহ ইতি বা উৎকৃষ্টরূপেন ভাবিতো রত্নাদ্যলঙ্কারেণ প্রাকৃত শরীরবৎ সুসজ্জীকৃতো বিগ্রহো যস্যাঃ সা।"

অর্থাৎ মহাভাবরূপ উজ্জ্বল চিন্তামণি দ্বারা সুসজ্জীকৃত দেহ যাঁহার, তিনিই "মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহা।"

প্রাকৃত দেহ রত্নাদি দ্বারা সুসজ্জীকৃত হইয়া থাকে। শ্রীরাধার অঙ্গ অপ্রাকৃত, সুতরাং প্রাকৃত রত্নাদিতে সেই দেহের সাজসজ্জা সুশোভন নহে। এই জন্য মহাভাবরূপ রত্ন দ্বারা তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সুসজ্জিত। ব্রজ-সুন্দরীগণ সকলেই মহাভাববতী। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী, যেহেতু তাঁহাতেই মহাভাব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। মোদন-মাদন অধিরূঢ় মহাভাব শ্রীমতীতেই বিরাজমান।

এই ভাবময় শ্রীঅঙ্গের কান্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত সদ্গন্ধযুক্ত যে কুঙ্কুমাদি দ্রব্যের ব্যবহার হয়—তাহা সখীপ্রণয়। সখীপ্রণই কুঙ্কুমাদির কার্য্য সাধন করে। অতঃপরে স্নানের ব্যবস্থা। সুকুমারীরা সাধারণতঃ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই তিনবার স্নান করিয়া থাকেন। ইহাকে ত্রিসবন স্নান বলা হয়। নদ্যাদির প্রবাহেই প্রাতঃস্নান প্রশস্ত। তজ্জন্য

কারুণ্যামৃতবীচী দ্বারাই প্রাতঃস্নানের প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে। কারুণ্য-রূপ জল বা পীযূষের তরঙ্গে শ্রীমতী রাধার প্রাতঃস্নান হইয়া থাকে। বয়ঃসন্ধিতে বাল্যচাপল্য দূরীকৃত হওয়ায় কারুণ্যভাবের সঞ্চার হয়, সুতরাং কারুণ্যরূপ জলপ্রবাহের তরঙ্গে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ প্রথমে পরি-স্নাত হয়েন।

মধ্যাহ্নে সুকুমারীগণ নদীর ঘাটে স্নানে অসমর্থা। সুতরাং দাসীগণের দ্বারা আনীত জলে তাঁহারা স্নাত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত মধ্যাহ্নকালীয় স্নানের নিমিত্ত তারুণ্যামৃত ধারার কথা লিখিত হইয়াছে। তারুণ্যামৃত শব্দের অর্থ যৌবনামৃত। সায়াহ্নে নিদাঘতাপপ্রশমনের নিমিত্ত অব-গাহন স্নানই প্রশস্ত, এই নিমিত্ত লাবণ্যামৃতবন্যা দ্বারা স্নানের কথা বলা হইয়াছে। সায়াহ্নের স্নানান্তে সুকুমারীদের অঙ্গলাবণ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লাবণ্যামৃতবন্যাস্নাত শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গকান্তির দর্শনে বিভোর হইয়া তদীয় দাসীরূপা শ্রীরতিমঞ্জরী যে আনন্দলাভ করেন, এই কথাগুলি তাহারই কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি মাত্র। লজ্জাই তাঁহার পট্টবস্ত্র। শ্রীমতী যে লজ্জাবতী, এতদ্দ্বারা তাহাই সূচিত হইল। সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম এবং শ্যামরস বা শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরী দ্বারা তাঁহার কলেবর চিত্রিত। কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা এই নয়টী ভাব-বত্ন দ্বারা তাঁহার দেহ অলঙ্কৃত।

অতঃপরে লিখিত হইয়াছে, "গুণালীপুষ্পমালিনীম্"। শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণি গ্রন্থে এই গুণসমূহের কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

মধুরেয়ং নববয়া শ্যামাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা।
চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা॥
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা॥
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী।
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষণী॥
গোকুলপ্রেমবসতি জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ।
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশাঃ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুলা কিং গুণা স্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥

ইনি মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্, নর্ম্মপণ্ডিতা বিনীতা, করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা, গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখী-প্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা, ইত্যাদি প্রধান গুণের কথা এস্থলে লিখিত হইল।

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধার গুণও অসংখ্য। এই সকল গুণের মধ্যে মধুরা হইতে গন্ধোন্মাদিতমাধবা পর্য্যন্ত ছয়টী দৈহিক গুণ, নর্ম্ম পণ্ডিতান্ত তিনটী বাচিক গুণ এবং বিনীতাদি দশটী মানসিক গুণ, এবং গোকুলপ্রেমবসতি ইত্যাদি ছয়টী পরসম্বন্ধীয় গুণ। সাকল্যে পঞ্চবিংশতি গুণের উল্লেখ আছে। এই সকল গুণ শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গের মাল্যস্বরূপ শোভাবর্দ্ধক। ধীরাধীরাত্মক ভাবই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য। প্রচ্ছন্নমানই কবরী। কবরী বস্ত্রাবরণে আবৃত থাকে, সুতরাং উহাতে প্রচ্ছন্নমানের আরোপ করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ইনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা এই নিমিত্ত ইনি সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলা। সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণশালিনীত্বের পরিচায়ক, এই জন্য ইহা শিরোধার্য্য তিলক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশ ইহাই শ্রীরাধার কর্ণভূষণ। ফলতঃ প্রেমময়ী শ্রীমতীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা স্পৃহনীয় কর্ণভূষণ আর কি হইতে পারে?

অনুরাগই তাম্বুলরাগ। এই অনুরাগ তাম্বুলে শ্রীরাধার ওষ্ঠরঞ্জিত। মুখেই অনুরাগের প্রকটতা পরিলক্ষিত হয়। প্রেমের স্বাভাবিক বক্রতাই শ্রীমতীর নয়ন-কজ্জলরূপে কল্পিত হইয়াছে। চক্ষু দ্বারাই এই বক্রতা প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রেমবক্রতা কজ্জলরূপে আরোপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও সখীদের নর্ম্ম বাক্য হইতে শ্রীরাধার যে মৃদুমধুর হাস্যোদ্গম হয়, সেই মৃদুমধুর হাস্য কর্পূর সদৃশ। সৌরভ তাঁহার অন্তঃ-

পুর সদৃশ, গর্ব্ব তাঁহার পর্য্যাঙ্ক তুল্য, এবং প্রেম বৈচিত্ত্য ভাবমধ্যস্থিত উজ্জ্বল পদকবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বত্রপ্রসৃতা কীর্ত্তিকেও সৌরভ বলা যায়। এই শ্লোকের অর্থ এই যে শ্রীরাধা কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুরে গর্ব্বরূপ পালঙ্কে উপবিষ্টা এবং প্রেম বৈচিত্ত্যরূপ পদকে পরিশোভিতা। তাঁহার প্রণয়ক্রোধই কঞ্চুলিকাবন্ধ কাঁচুলীবন্ধ)। প্রণয় ক্রোধ দ্বারাই তিনি স্তনমণ্ডল গোপনে রাখেন। শ্রীরাধার স্বীয় যশ সম্পত্তিই তাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপীবীণাবর। এই যশঃশ্রী সদীয় সপত্নীগণের মুখ-হৃদয়শোষিণী। শ্রীরাধার যশের রবে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মুখ ও হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া যায়। মধ্যাঙ্গরূপ সখী স্কন্ধে শ্রীরাধার করাম্বুজ লীলায় বিন্যস্ত। (এই অংশ অতীব দুর্ব্বোধ্য।) শ্রীরাধা শ্যামা অর্থাৎ সর্ব্বিশেষ গুণবতী। শ্যামাস্ত্রীর একটী গুণ এই যে ইঁনি শীতকালে উষ্ণা এবং গ্রীষ্মকালে শীতলারূপে অনুভূত হয়েন। শ্যামা শব্দের আরও একটা অর্থ এই যে :—

'কান্তাকর্ষণশীলা যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।'

অর্থাৎ যিনি কান্তাকর্ষণশীলা তিনিও শ্যামা। ইহার আর একটা গুণ এই যে ইঁনি শৃঙ্গাররস দ্বারা কন্দর্পমদ ও তাঁহাপমধুপরিবেশনকর্ত্রী। এই গূঢ়গভীরার্থ অংশও পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজনীয়। আমার কাল্পনিক ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্তবিরোধ রসাভাস বা রসভঙ্গ হইতে পারে, এই ভয়ে নিজে কিছুই বলিতে সাহসী নহি।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীরাধিকার এই সকল গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরি, আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতিপুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি এই অতি দুঃখিত ব্যক্তিকে স্বকীয় দাস্যরূপ অমৃতসেকে সঞ্জীবিত করুন। দুষ্টব্যক্তিও যদি শরণাগত হয়, দয়াময় প্রভু তখন তাহাকেও ত্যাগ করেন না। হে গান্ধর্ব্বিকে, আমিও তাদৃশ দুষ্ট শঠ ও কপটী, কিন্তু এখন আপনারই দাস্যভিখারী, এ অধমকে পরিত্যাগ করিবেন না ইহাই প্রার্থনা।

এই প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্য স্তবরাজ শ্রীরাধা কৃপালাভের হেতুস্বরূপ।

যিনি ভক্তিসহ এই স্তব পাঠ করেন তিনি শ্রীরাধিকার দাস্যলাভে সমর্থ হয়েন।"

উৎকণ্ঠাদশক।

১। যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি কষিত কাঞ্চন অপেক্ষাও* সমুজ্জ্বলা ও সুচিক্কণ, যিনি প্রফুল্লমুখী, বয়ঃসন্ধি বশত যিনি রম্যা, যাহার পরিধানে সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র, মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যশালী ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় যাঁহার বেণী বিলাসযুক্ত, যিনি প্রমুদিতা ও সুবেশা যিনি আডনয়নে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ঈষৎ দৃষ্টিশালিনী, —কবে আমি তাদৃশী শ্রীরাধার ভজন করিব?

২। শ্রীগোবিন্দরূপ ভ্রমর স্ফূর্তিময়ী গোপীগণের মুখারবিন্দ মধু প্রীতিসহকারে পান করিতে করিতে সহসা যাহার রমণীয় তনুর উল্লাসশীল পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া অপরা গোপীগণকে ত্যাগ করেন এবং মদমত্তের ন্যায় পথে পথে যাহার নিমিত্ত ইতস্তত ভ্রমণ করেন, কবে সেই বৃন্দাবনারণ্যবরেণ্য কল্পলতিকা সদৃশী সেই শ্রীরাধার ভজন করিব?

৩। শ্রীরাধাকুণ্ডতটবর্ত্তি কুঞ্জগৃহে মনোহর মল্লিকা ফুলের কোমল দলনির্ম্মিত কুসুমশয্যায় ক্রীড়াকল্পাগুরু গর্ব্বিত মাধবকে পাশা খেলায় হারাইয়া দিয়া শ্রীরাধা যখন মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে তাহাকে উপহসিত করার নিমিত্ত কটাক্ষভঙ্গীতে সখীদিগকে নিযুক্ত করেন —তাদৃশ অবস্থা দেখিতে দেখিতে কবে আমি শ্রীরাধিকার ভজন করিব?

৪। রাসলীলায় সখীগণ পরিবৃতা হইয়া যিনি প্রেমরসে শ্যামসুন্দরের

* এই ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রাচীন বৈষ্ণবপণ্ডিত শ্রীল রঙ্গবিহারি বিদ্যালঙ্কারকৃত বিবৃতির অভিপ্রায়ানুসারে লিখিত হইল। এই স্তবরাজের মর্ম্ম অতি গূঢ় রহস্যময়। বিবৃতির অনেক স্থলই দুর্ব্বোধ্য ও অস্ফুট বলিয়া অনুভূত হইল। অনেক স্থলেই রূপকের ভাব ও তাৎপর্য্য অতি কঠিন। অপর কোন সুবিজ্ঞ বৈষ্ণব পণ্ডিত এই নিগূঢ় রূপক-রহস্যভেদ করিয়া পরিস্ফুট তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জানি না।

১০। যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তরা, অথচ এই শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুর কণামাত্রও যাহার প্রাণ হইতে অধিকতর প্রিয়, যাহার কীর্তি ত্রিজগৎ পরিব্যাপিনী এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের শিরস্থিত উৎকৃষ্ট ভূষণমণিস্বরূপ,—আমি কবে সেই ধন্যতমা শ্রীরাধার ভজন করিব?

১১। যিনি স্থিরবুদ্ধি সহকারে সুস্বর সংযোগে এই অভিনব উৎকণ্ঠা-দশক স্তব দ্বারা বৃন্দাবনানন্দপদ্মোদ্ভবিনী শ্রীরাধার স্তব করেন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রাণসম শ্রীরাধার গুণ আস্বাদনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধা-সেবারূপ অমূল্য অভীষ্ট বস্তু শীঘ্র প্রদান করেন।

প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশক

১। রূপমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিতেছেন দীপাবলী পর্বে শ্রীমতী যশোদা উজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিত গোপমহিলাদের সহিত গান কৌতুকে অতি ভক্তিভরে গোবর্দ্ধন পূজা সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠে হরিদ্রাদ্রব দ্বারা করলক্ষ্মীর আকার চিত্রিত করিয়াছিলেন। সহচরি, ঐ দেখুন দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ সেই চিত্রধারণ করিয়া মেঘগম্ভীরস্বরে গোসমূহকে ক্রীড়া করাইতেছেন।

২। ঐ দেখুন গোসমূহের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে নন্দরাজ, তাঁহার পশ্চাতে গোপগণ, তাহাদের পশ্চাতে নিখিল ব্রজমহিলাদিগকে সঙ্গে করিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী যশোদা গমন করিতেছেন। তাহাদের পশ্চাতে ঐ দেখুন আমাদের ব্রজশশী মিত্রগণের সহিত কৌতুকচ্ছলে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন।

৩। যে যুগলদেবের সমুদ্যৎ কারুণ্যামৃত বিতরণে এই জগৎ সঞ্জী-বিত হইতেছে, যে যুগলদেব স্বীয় গুণকুসুম সমূহের সুগন্ধে জনসকলকে বাসিত করেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল যদি আমার প্রতি কৃপা না করেন, তবে হে সহচরি, হে দেবি রূপমঞ্জরি, যাহাতে আমি এই শ্রীকুণ্ডে দেহ-পাত করিতে পারি, আপনি সেই আজ্ঞা করুন।

৪। এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর আবেশ তিরোহিত হইল, তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "হায়, উদ্দামরসকেলিময়-তনু শ্রীরাধাকৃষ্ণ কোথায়, ললিতা বিশাখা কোথায়, আমার প্রাণবল্লভ গৌরচন্দ্রমা কোথায়, আর আমার হৃদয়সুহৃদ শ্রীরূপসনাতনই বা কোথায় ? আর কত দিন এই দুঃসহ বিরহ-জ্বালা সহ্য করিব, রে ললাট তুমি বিদীর্ণ হও।

৫। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে আবার ব্রজলীলার আবেশ হইল, তখন তিনি শ্রীরূপমঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সহচরি ঐ দেখুন দেখুন, শ্রীনন্দকৃত পর্ব্বোপলক্ষে নন্দীশ্বরবাসী জনগণের সভায় রবিকরপ্রকটিত-কমলকান্তির ন্যায় দূরস্থ শ্রীকৃষ্ণের নয়নকটাক্ষে শ্রীরাধি-কার বদনপ্রান্তে কেমন মৃদুহাসি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

৬। আরও দেখুন, মেঘমালাবিচ্ছুরিত নীলাকাশে সুধাময় চন্দ্রে অতিতৃষিত চাতকীর লালসা যেমন ধাবিত হয়, ঠিক সেই প্রকার শ্রী গোবর্দ্ধনগিরির সমীপবর্ত্তী গিরিধারী শ্রীগোবিন্দের [illegible] নবচন্দ্রমার অভিমুখে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধাচকোরী নেত্রভঙ্গীচ্ছলে বিচরণ করিতেছেন,

৭। রতি, গৌরী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, ও অপরা ব্রজনারীগণের সৌন্দর্য্য এমন কি চন্দ্রাবলীরও সৌন্দর্য্য যাহার কান্তির নিকট পরাভূত, এতাদৃশী শ্রীরাধার শোভাসম্পদবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে আমি ক্রমানুসারে শ্রীঅঙ্গের বেশকর কোন্ কোন্ উপকরণ স্থাপন করিব ?

৮। স্বর্ণকুম্ভশোভাবিনিন্দি, সৌরভপুষ্ট ও পুলকিত শ্রীরাধার স্তন-যুগলকে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক হইলে আমি তাঁহার শ্রীহস্তে কবে সেই গন্ধদ্রব্য যোগাইয়া দিব ?

৯। সহচরি, ঐ দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে ভুজলতা স্থাপন করিয়া কোন এক রমণী কত আদরে গোবর্দ্ধনের কাননশোভা নিরীক্ষণ করি-তেছেন, আপনি কি বলিতে পারেন ইনি কে ? ওঃ বুঝেছি বুঝেছি, ইনি আমাদের সেই প্রণয়চটুলব্যাকুলা, অনুরাগ ভরে অতি সুন্দরী শ্রীরাধিকা ভিন্ন আর কে ?"

১০। (আবার ব্রজলীলার আবেশ তিরোহিত হইল। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আবার শ্রীরূপের বিরহে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন) "হায় আমার জীবনোপায় স্বরূপ শ্রীরূপ কোথায়? তিনি অপূর্ব্ব প্রেমসাগরের পরিমল সলিলের ফেণরাশিতে কৃপা করিয়া আমাকে যেরূপ পরিসিক্ত করিয়া রাখিতেন, জগতে সেরূপ কৃপার তুলনা নাই। হায়, এখন আমি দুর্দ্দৈব দাবানলগ্রস্ত হইয়াছি। আমার আব দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এখন আমার সেই জীবনোপায় শ্রীরূপ ব্যতীত আমি আব কাহার শরণ লইব?

১১। এখন এই মহাবিবহে মহাগোষ্ঠ শূন্য শূন্য অনুভূত হইতেছেন, আমাব অতি প্রিয় গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় মনে হইতেছেন, এমন কি অতি প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডও ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

১২। ভৃগুপাতেও যদি আমার এ দেহপতন না হয়, তাহা হইলেই বা এ দেহেব দোষ কি? বিধাতা যে আমাব এই দেহকে বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিযাছেন। এই দেহ-পতন না হওয়াব আরও একটি কাবণ আমি গাঢ বিচাবে বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, এই দুঃসহ দুঃখ-ভাব এ জগতে আমি ভিন্ন আব কে বহন কবিবে?

১৩। যাহা হউক, এখন আমাব প্রার্থনা এই যে আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তি বচনা কবিতে করিতে, এবং প্রগাঢ় প্রেমে শ্রীরাধাকৃষ্ণেব রমণীয় পাদপদ্ম স্মরণ কবিতে করিতে চিরদিন যেন শ্রীরাধাকুণ্ডেই বাস কবি।

১৪। হে নাথ শ্রীরূপ, তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ কব যে গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে বাস, রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারণ এবং ব্রজের দধি তক্র পান করিতে করিতে যেন আমার দিনগুলি অতিবাহিত হয়। *

* এই প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর দুইটী দশা স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। তিনি অন্তর্দ্দশায় শ্রীরতিমঞ্জরীরূপে শ্রীরূপমঞ্জরীকে যুগললীলা দর্শন করাইয়া প্রেমানন্দ ভোগ করিয়াছেন, আবার বাহ্যদশায়

অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টক।

১। বাষ্পাকুললোচনা শ্রীমতী যশোদাদেবী খেলারত শ্রীকৃষ্ণের লালন করিতে করিতে যে রাধাকে বারংবার নিরীক্ষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনলালসায় উৎকণ্ঠিতা রোহিণীদেবী সর্ব্বদা নিকটে থাকেন বলিয়া যাঁহার নিবেশ-সম্ভাবনা আবৃত হয়, সুতরাং 'যনি অবনত বদনে অবস্থিতা, আমি বৃন্দাবনে বিশাখার সেই প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে কবে তাম্বুল দ্বারা সেবা করিব?

২। (এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ব্রজলীলা পরিকর-সিদ্ধদেহের জ্ঞান হইল। সেবাসুখ লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার চিত্তে যে অতৃপ্ত বাসনার উদয় হইয়াছিল, সেই বাসনা সম্পূরণের নিমিত্ত তিনি দৈন্যতাময়ী প্রার্থনায় কাতরকণ্ঠে বলিলেন) "কবে আমার এমন দিন হবে, যখন শ্রীরাধা নিজ গৃহে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উজ্জ্বল হার গাঁথিতে আরম্ভ করিবেন, আর আমি তখন কৌটা হইতে মণি অন্বেষণ করিয়া উক্ত হার তাঁহার শ্রীহস্তে প্রদান করিয়া নিজের এই ভুজলতার সার্থকতা সম্পাদন করিব?

৩। যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ-লীলারাজ্যে বিজয়িনী ঈশ্বরীরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণের শ্রেষ্ঠা, যিনি আপন রাজ্যের প্রজাস্বরূপ ভ্রমর ও কোকিলগণ সহ ক্রীড়াশীলা, সেই বৃন্দাবনমহেশ্বরী শ্রীরাধা কবে আমায় প্রমোদিত করিবেন?

রাধাকৃষ্ণ-বিরহে, ললিতা বিশাখার বিরহে, মহাপ্রভুর বিরহে এবং শ্রীরূপ-সনাতনের বিরহে কুররীর ন্যায় আকুলভাবে বিলাপ করিয়াছেন। এই স্তোত্রের স্থানে স্থানে রঘুনাথের অতি চমৎকার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সুরসিক পাঠক মহোদয়গণ এই স্তোত্রের অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দুইটী পদ্য আস্বাদন করিয়াও এই উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। শেষের দুইটী পদ্য শ্রীরঘুনাথের চির অভিলষিত সরল প্রার্থনা।

৪। শ্রীমতী রাধা যমুনাতীরে তিন চারিটী সখীসহ আনতবদনে কুসুমমালা গাঁথিতে থাকিবেন, এমন সময়ে রসরাজ শ্যামসুন্দর সহসা আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবেন—এই অবস্থায় কবে আমি ব্যজনিনী সেবাদাসীর ভাবে চামর ব্যজনে শ্রীরাধার সেবা করিব?

৫। আমার এমন দিন কবে হবে, যখন নির্ম্মল পুলিনস্থলে রস-সৌন্দর্য্যের প্রভাবে সুবর্ণাঙ্গী গোপীগণের প্রত্যেকেই নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সুন্দরী বলিয়া মনে করিবেন, তখন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যরূপ স্বর্ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ নীলনলিননিভ নিকষ-প্রস্তরে পরীক্ষিত হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়া যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গুণশালিনী তাঁহাতেই আসক্ত হইবেন। এই পরীক্ষায় যে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া কীর্ত্তিতা, সেই আরাধ্যা কবে এই বিজয়সূচক গুণের প্রভাবে আমার নিকট উৎকৃষ্ট বলো। ভাব প্রতিভাত হইয়া আমাকে আলিঙ্গিত করিবেন?

৬। আমার এমন দিন কবে হবে, যখন ভাণ্ডীরবনের নির্জ্জন মঞ্জু কুঞ্জে কুসুমশয্যায় বসিয়া রসরাজ শ্যামসুন্দর চিত্রপট অঙ্কন করিবেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া সেই চিত্র সন্দর্শন করিবেন, আর আমি সকৌতুকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রং যোগাইয়া দিয়া শ্রীরাধার সেবা করিব?

৭। আমার এমন দিন কবে হবে যখন শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ-সমূহের নিভৃত স্থানে লতাকুঞ্জ দেখিয়া উহাদের প্রশংসা করিয়া কেলীলার কথা শ্রীমতীর স্মৃতিপথে আনিয়া দিবেন, তখন শ্রীরাধা ঔৎসয্যবশতঃ নিজের আত্মকথা গোপন করার মানসে লজ্জাসঙ্কোচে অতি দ্রুত ও অতি অস্পষ্টভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন "ওগো তুমি এ কি বলিতেছেন?"

৮। (অতঃপর ললিতার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি যেন একটুক অভিভূত হইলেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীরাধার সেবা করিনা, ইহা অঙ্গনের বিষয় হইতে পারে। ললিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী

হওয়াই তাঁহার নিত্যব্রত। এই নিমিত্ত তিনি ললিতার স্তব করিয়া বলিতেছেন :—) যিনি আমার নিত্যগতি, যিনি সখীগণের নিখিল ধন, যিনি মদাগ্বী শ্রীরাধার প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ন্যায় ভালবাসেন, সেই ললিতাসখী এই কুণ্ডসমীপে আমার মানসসমক্ষে প্রকাশিত হউন।

প্রেমপূরাভিধ-স্তোত্র।

১। শ্রীরাধে, চন্দ্রকিরণ উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নাময়ী মধুর বসন্তনিশিতে তুমি যখন কুন্দকুসুম শুভ্রবসন ও কর্পূরভূষণে সজ্জিত হইয়া বৃন্দার স্কন্ধে ভর দিয়া [illegible] পশ্চাতে পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণাভিসারে গমন কর, তদবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্তও দর্শন দিয়া আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর। *

২। শ্রীরাধে, তুমি তোমার স্বভাবসুলভ প্রেমবাম্যবশতঃ মদন-বিলাসকুঞ্জে না যাইয়া যখন নিজগৃহের পথ অনুসরণ কর, আর কৃষ্ণ তখন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করেন, এবং নানাপ্র মিনতির ক্য বলিয়া তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন, ত

* এই স্থলে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী জ্যোৎস্নী অভিসারিকা শ্রীরাধিকার সন্দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। অভিসারিকাকে আত্মগোপন করিয়া যাইতে হয়, তাই জ্যোৎস্নায় অভিসারে শুক্লবসন ও শুভ্র ভূষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা শ্রীউজ্জ্বলে :—

"ত্বং চন্দ্রাঙ্কিতচন্দনেন খচিতা ক্ষৌমেণ চালঙ্কৃতা"

অর্থাৎ বিশাখা বলিতেছেন, "রাধে, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তুমি কর্পূর চন্দনে অঙ্গ লেপন করিয়া এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া সত্বরে গমন কর।" অতসীর সূক্ষ্মতন্তু দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার নাম ক্ষৌম।

তোমার নয়নকোণে যে হাসির রেখা দেখা দেয়, সেই অবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্ত আমায় নয়নের আনন্দ দান কর।

৩। শ্রীরাধে, মাধবের জলধরনিভ উন্নত বক্ষে তুমি স্থির বিদ্যুল্লতিকা বা মনোহর কনকযুথিকার মালার ন্যায় বিরাজিতা হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

৪। শ্রীরাধে, কামবিলসিত কুসুমশয়নে তুমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যথেচ্ছ ভাবে আলাপ করিতে করিতে গাঢ় আলিঙ্গনে উভয়ে একদেহ হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

৫। শ্রীরাধে, প্রমদমদনকেলিতে পরিক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রসর বক্ষশয্যায় শয়ন করিয়া বিশাখার জীবনস্বরূপিণী তুমি ক্ষণেকের তরেও আমার নয়নানন্দ বর্দ্ধন কর।

৬। (এ স্থলে স্বাধীন ভর্ত্তৃকার ভাব বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে) "শ্রীরাধে, সুরত অবসানে স্বাধীন ভর্ত্তৃকার সৌভাগ্যদৃপ্ত প্রণয়শ্লথা ললিতা সখীর গর্ব্বে* প্রমত্তা হইয়া অতি অল্প আদেশে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা স্বীয় বেশ ও শয্যাদি বিরচিত করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও তুমি আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

৭। শ্রীরাধে, মদনমনোহর নিকুঞ্জপ্রাঙ্গনে হাস্যপরিহাস সভায় তুমি ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বক্রোক্তিতে পরাস্ত করায় সখীগণ তোমার প্রশংসা করিবে,—এতাদৃশ অবস্থায় তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

* এখানে রসশাস্ত্রের একটী বিচার আছে। অধিক শব্দ প্রয়োগে গর্ব্বে রসদোষ ঘটে। তাই এখানে "দর গদিত" অর্থাৎ "অল্প" বাক্যেই" এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেখানে বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন বিবক্ষিতার্থে প্রতীতি হয় না, সেস্থলে অল্প শব্দ প্রয়োগ দোষজনক নহে। যথা :—

কচিদুক্তৌ স্বশব্দেন ন দোষোব্যভিচারিণঃ
অনুভাব বিভাবভ্যাং রচনা যত্র নোচিতা।

৮। শ্রীরাধে, কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অত্যল্প অপরাধ দেখিয়াও ম মানিনীর বেশে মৌনব্রত অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ চাটুবাক্য রা তোমার প্রসন্নতা সাধনে প্রার্থনা করেন, তুমি তাদৃশ অবস্থায় ণকালের নিমিত্তও আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

৯। হা কৃপাসাগরে, হা দেবি শ্রীরাধে, তুমি এই ব্রজপুরে তোমার পতৃদেব বৃষভানুর ভাগ্যলক্ষ্মী, তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়কাননের নিত্য-হচরী ভ্রমরাস্বরূপিণী, এবং নিজ সখীগণরূপ কুমুদকুসুম সমূ-হর কৌমুদী স্বরূপা। তুমি ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার নেত্রানন্দ দ্ধন কর।

১০। হা অসীম গুণসিন্ধু শ্রীরাধে, তুমি শ্রীকৃষ্ণের আদি বন্ধু, তুমি নরূপম-গুণশালিনী সখীবৃন্দের মুকুটমণি। হা কৃপাদ্রে, আমি দুঃখসাগরে জ্জিত হইয়া রহিয়াছি। তুমি ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন কর।

১১। হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, আপনি আমার হৃদয়কুমুদ প্রকাশ করুন, আমাতে আপনার পাদপদ্ম চিন্তনরূপ ভ্রমর প্রেরণ দ্বারা প্রীতিবিধান করুন। আমার আরও প্রার্থনা এই যে, হে দয়াময় এ অধমের অপ-রাধরূপ নিবীড় অন্ধকার দূর করিয়া এই দুর্গত জনকে আপনার চরণা-মৃত পান করান।

১২। "কোকিলকূজন বাদ্যে এবং ভ্রমরঝঙ্কার গানে নিরূপম নিকুঞ্জ-বন রঙ্গালয়রূপে পরিণত হয়। এতাদৃশ রঙ্গালয়ের কন্দর্প সভায় কন্দর্পের প্রসাদন নিমিত্ত নৃত্য করিতে করিতে যে রাধাকৃষ্ণযুগল পরিশ্রান্ত হয়েন, আমি সেই নৃত্যপরিশ্রান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য চামর ব্যজন করি।" (এই পদ্যটী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অন্তর্দ্দশায় যুগল-সেবার বাহ্য অভিব্যক্ত।)

১৩। যাঁহার পাদপদ্মযুগ বিচ্যুরত রসের সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড সমীপবর্ত্তি গোবর্দ্ধন নিকটে বাস করিতেছি, যাঁহার প্রিয়গণ দ্বারা লালিত পালিত হইয়া অমৃতধারা বিজয়নী শ্রীকৃষ্ণনামা-বলী কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতেছি, সেই শ্রীরূপ পুনর্ব্বার আমায় রক্ষা

করুন। (মূল পদ্যে বহরমপুরের গ্রন্থে এই স্থলে শ্রীমান্ স্বরূপোব এইরূপ পাঠ আছে, উহাভুল। "শ্রীমান্ স রূপোঽবভু" এইরূপ পা হইবে।)

অভীষ্টসূচন-স্তোত্র।

১। শ্রীকৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার দাস্যে আমার অভিলাষরূপ অশ্বারো শ্রীরূপের চিন্তারূপ অমল অশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমার দন্দান্ত ম ঘোটকে আরোহণ করুক।

২। শ্রীরূপ গোস্বামীর যত্নেই আমার মন প্রথমতঃ শম (ভগবন্নিষ্ঠ দম (জিতেন্দ্রিয়তা), আত্মবিবেক ও ধ্যান দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া ভ বত্তত্ত্বে লগ্ন হইয়া ছিল। সেই শ্রীরূপের সুধামধুর সস্মিত সদয়-দৃষ্টি লা য়া এখন আমার মন হরিচরিতে মত্ত হইয়াছে।

৩। হে মৃগকন্যাগণ তোমরা নিভৃতে থাকিয়া সততই শ্রীকৃষ্ণে মুখপাঙ্কজ সন্দর্শন কর, তোমরাই ধন্য। কিন্তু বৃন্দাবনে বাস করিয়াও ক্ষণকালের নিমিত্ত ঐ শ্রীমুখপঙ্কজ দ করিতে পাইলাম না। আমি কেবল উদরভরণের বৃত্তিতেই ঘুরি বেড়াইতেছি। হায় আমি বিনষ্ট হইলাম।

৪। (আবার অন্তর্দশা) সখী রূপমঞ্জরি! যে রাধাকৃষ্ণ অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন, এবং যাঁহারা বহু সঙ্গমপ্রয়াসে এক্ষণে কুঞ্জমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাদের তাম্বুলসেবা শেষ করিয়া আমাকে ঐ যুগলচরণে সমর্পিত করিয়া দিউন।

৫। সখী রূপমঞ্জরি, নিবীড় রতিবিলাসশ্রমে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত অলসিত, শ্রমজলকণা সমূহে যাঁহার স্তনযুগল আর্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃপীঠে যাঁহার স্বীয় দেহ বিন্যস্ত—আমি কি এতাদশ অবস্থায় আপনাদের সেব্যমানা সেই শ্রীমতীর দর্শন পাইব?

৬। (বাহ্যদশায়) যিনি দৈত্যকুল বিধ্বস্ত করেন, যিনি স্বজন চকোরগণের প্রতি প্রেমপীযূষ বর্ষণ করেন, যিনি স্বীয় শীতল কিরণে

রাধারূপ কুমুদ সকলের প্রফুল্ল অঙ্গলতিকায় কুচকুসুম প্রকাশ করেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমার রক্ষা করুন।

৭। রসময় রাসে নৃত্য, গোবর্দ্ধন সমীপে দধির শুল্ক আদায় করার নিমিত্ত দানকেলি বিবাদ, সখীগণের মধ্যে স্মরবায়ুসমুথ কেলিতরঙ্গ,—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই সকল লীলা সন্দর্শনের শুভদিন আমার পক্ষে কবে উদিত হইবে ?

৮। রোহিণী দেবীর আশীভাজন এবং আনন্দ ভয়মিশ্র দর্শনীর বস্তু, প্রীতি ও সাশ্রুনেত্রে যশোদা দ্বারা শ্রীহলধরের হস্তে সমর্পিত যশোদার প্রাণধন, ব্রজবাসিগণের গর্ব্ব ও স্নেহের পাত্র, শ্রীরাধিকাদির শ্লাঘার পদার্থ—যিনি গোপকুলের ভর্ত্তা হইয়াও গোরাখাল—সেই গোষ্ঠগামী কৃষ্ণ গোপাল আমার রক্ষা করুন ?

৯। "সখি এই ব্রজবধূটী কে ? এ কোথা হ'তে এল ? ইহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই, তথাপি কোথাও যেন দেখিয়াছি-দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে" সখী বলিলেন, "তোমাকে ভজনা করার নিমিত্ত মথুরা হইতে এই নিরুপমা রমণী আসিয়াছে।" ইহার উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন, "এই অপূর্ব্বা রমণীকে অপাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করাও।" শ্রীরাধার এই সমুজ্জ্বল বাগ্‌ভঙ্গীতে নিজের ছল প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন।

১০। "রাধা" এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় চিত্তাকর্ষি, "কৃষ্ণ" এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের ন্যায় অতিশয় স্বাদু, হে ক্ষুধাতুরা রসনে, তুমি এই দুই বস্তুকে সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিম দ্বারা রম্য করিয়া পান কর।

১১। এই রসপূর্ণ "প্রেমপূর" দশক স্তোত্র রঙ্গালয় স্বরূপ। যিনি এই স্তোত্রদশকে রুচিরূপ নান্দীকে * অঙ্গীকার করিয়া সূত্রধার

---

* মঙ্গল স্তুতির নামই নান্দী। "নান্দীস্যান্মঙ্গল স্তুতিঃ"। নাটকাদিতে দেবাদ্বিজগণের মঙ্গলার্থ আশীর্বচনই নান্দী।

আশীর্ব্বচন সংযুক্তা স্তুতি র্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।

প্রবরেরা ন্যায়, জিহ্বারূপা নটিনীকে নৃত্য করান, অর্থাৎ যিনি এক চিত্তে প্রীতি সহকারে এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যুগল-স্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদলাভ করেন।

স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্র।

১। শ্রীরাধার পাদপদ্মরেণুর আরাধনা ব্যতীত, শ্রীপদাঙ্কিত শ্রী বনের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত, এবং গম্ভীরচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণের সেবা ব্য শ্যামসিন্ধুর প্রেমরসে অবগাহন করা অসম্ভব। §

২। (অতি কাতরে স্বসঙ্কল্প প্রচার সময়ে শ্রীরূপমঞ্জরীর আ অনুভব করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরতিমঞ্জরী বলিলেন,) আমি ললিতা প্রেরিতা, এই জানিয়া শ্রীরাধা স্নেহোল্লাসে অভিনব কাব্য, স্বকৃত অতুল নাটক ও গূঢ়ার্থা প্রহেলিকা প্রভৃতি কবে বারংবার শিক্ষা দিবেন।

দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি কীর্ত্ত্যতে ॥

শ্রীপাদ রূপগোস্বামি মহোদয় নাটকচন্দ্রিকায় যে নান্দী লিখিয়াছেন তাহা এই :—

প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দীকার্য্যা শুভাবহা।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশাণ্যতমান্বিতা ॥
অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিম্বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ।
চন্দ্রনামাঙ্কিতাপ্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা।
(মঙ্গলং-চন্দ্রকমল-চকোর-কুমুদাদিকম্)

† সূত্রধার,—নটোত্তম। যথা নাটক চন্দ্রিকায়—

সূত্রধারঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ কথা-সূত্রার্থসূচকঃ।

যিনি নাট্যকথার সূত্রার্থ সূচনা করেন, তিনি সূত্রধার।

§ আপাতঃ দৃষ্টিতে এই পদ্যে ক্রমভঙ্গ দোষ পরিলক্ষিত হয়। এ স্থলে সর্ব্বপ্রথমেই শ্রেষ্ঠতম আরাধ্যের কথা বলা হইয়াছে। ক্রমোৎকর্ষ না দেখাইয়া ক্রমাপকর্ষই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতর

সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে শিক্ষালাভ করিয়াছি, কিন্তু কোন কুঞ্জে যুগল কিশোরের উৎকট স্মরমত্ততানিবন্ধন বিষম সংগ্রাম সময়ে. চিত্রগুলি যখন পরিত হইয়া যাইবে, তখন আমি সেই চিত্রগুলিকেই কি পাতায় তুলিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব?

৭। সখি, তুঙ্গবিদ্যা বিবিধ বিদ্যার আধার। তাঁহার অদ্ভুত শ্রী পদ্মাবতী প্রভৃতি নবীন নারীগণ পরাজিতা। ইনি যুবতীবর্গের স সর্ব্বজন সমক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রীরাধিকার কপট ইঙ্গিতে ইনি কি আমাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করিবেন?

৯। ইন্দুরেখা আমাকে মুক্তা, গুঞ্জা, মণি ও কুসুমের হার র করিতে সুশিক্ষা প্রদান করুন। আমি যেন রাধাকুণ্ডের কুঞ্জগৃহে স্বর্ণ হারে যুগলকিশোরের শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত করিতে পারি।

১০। স্বীয় নামের আদ্য অক্ষর দ্বয়েই যাহার রঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে, এবং দেবী শব্দ দ্বারা যিনি ষোলআনা পূর্ণ হইয়াছেন, সেই রঙ্গদেবী য', রাসনৃত্যের প্রথমেই আমাকে নৃত্যক্রমগুলি শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে সুদৃশ্য এবং সরস রাসনৃত্যকারী যুগলকিশোরের বদনকমলে নটনপটুতা তাম্বুলবাটী (পানের খিলি) পুনঃ পুনঃ যোগাইয়া দিতে সমর্থ হইব।

১১। সখি, সুদেবী আমার এই গোকুলসুন্দরীগণের সম্মুখে পাশা খেলার উৎকৃষ্ট নিয়ম শিক্ষাদান করুন। তাহা হইলে পাশাখেলায় যুগল কিশোরের উভয়েই যখন জয়োন্মুখ হইবেন, আমি তখন নেত্রভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধাকেই বিজয়িনী করিতে পারিব।

১২। "চাটুকারী শ্রীকৃষ্ণ পদ্মদলে একটী গূঢ়ার্থ ও গোপনীয় পদ রচনা করিয়া উহা গোপনীয় ভাবে শুকপক্ষিদ্বারা পাঠাইবেন। পত্রখানি আমার হাতে পড়িবে", এইরূপ ঘটনা কখন্ ঘটিবে যে অ এতাদৃশী পত্রী প্রাপ্ত হইয়া এবং উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া মদী শ্রীরাধিকাকে লইয়া দ্রুতগতিতে গোবর্দ্ধন কন্দরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্থাপিত করিব?

২য়।

১৩। সখি, নেত্রকটাক্ষবাণে এবং নখদন্তাদি শস্ত্র দ্বারা যুগল যখন স্মরযুদ্ধে বিদ্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধেচ্ছু হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইবেন,

২১। আমি রঙ্গণলতা নাম্নী কল্পলতার বায়ু স্পর্শে ফলিত নি[illegible]খন মনে যে মনকলা খাইতেছি, এই অভ্যাসেই কি পরিজনপরিবৃত মদনসু[illegible] যুগলকিশোরের প্রকৃত সেবারত্ন লাভে সমর্থ হইব? অর্থাৎ রঙ্গণল[illegible] কৃপায় যুগলকিশোরের এই যে মানসী সেবা করিতেছি, এই সেবা প্রত্যক্ষভাবে করিতে সমর্থ হইব।

নবাষ্টক।

১। যিনি গিরিধরের প্রাণাধিকা প্রেয়সী, যিনি নিজের কোটি কো[illegible] প্রাণও শ্রীকৃষ্ণের পথ নির্মঞ্ছনের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, যিনি প্রাণস[illegible] ললিতার প্রেমলালিতা এবং বিশাখার নর্ম্মবাক্যে পরিবিক্তা, যিনি গৌ[illegible] গোষ্ঠবনেশ্বরী,—হে মন, সেই অনন্ত রসশালিনী শ্রীরাধার ভজনা কর।

২। শ্রীরাধাকুণ্ডতটান্তবর্ত্তি নিকুঞ্জ,—নিরন্তর সৌরভোৎফুল্ল পুষ্প[illegible] লুব্ধ ভ্রমরবৃন্দনিকরে গুঞ্জরিত। এই নিকুঞ্জে মদনমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের স[illegible] যিনি সতত মন্মথ-রাজকার্য্যে ব্যাপৃতা,—হে মন, সেই অনন্ত রসশালি[illegible] শ্রীরাধার ভজনা কর।

৩। শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষতরঙ্গে তরঙ্গিত কন্দর্প প্রভাবে যাহার ইন্দ্রিয়ের নিচয় নৃত্যশালী, বাগ্ভঙ্গীতে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরবুদ্ধ হইতে প্রার্থনা করেন, যিনি সস্মিত সখীগণের প্রদত্ত নর্ম্মবাক্য সুধাপানে প্রমত্ত [illegible] গর্ব্বিতা, হে মন, সেই অনন্ত রসশালিনী শ্রীরাধার ভজনা কর।

৪। 'যদি পাশককেলিতে তোমার জয় হয়, তবে তুমি তুইবার আমার অধর চুম্বন করিতে পারিবে' এই পণে যুগলকিশোর পাশা খেলি[illegible] প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এই ক্রীড়ায় প্রমত্তা ও গর্ব্বিতা শ্রীমতী পরাজি[illegible] হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার স্বীকৃ[illegible] শ্রীরাধার নির্ব্বাদঅধর চুম্বনকালে শ্রীরাধিকার কটাক্ষ ঈষৎ ব[illegible] [illegible] হইয়া উঠিল, দেহ রোমাঞ্চিত ও মুখে মধুর হাস্য দেখা দিল[illegible] তিনি [illegible] কৃষ্ণকে হস্তস্থিত ক্রীড়াকমল দ্বারা মৃদু মৃদুভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মন, এতাদৃশী রসশালিনী শ্রীরাধার ভজনা কর।

৫। যিনি প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের স্কন্ধদেশে সুসখ্যভাবে বামহস্ত ন্যস্ত করিয়া অভিনব বসন্তোদ্ভবা নবকাননশোভা সন্দর্শন করিতেছেন এবং বিশাখার সহ হর্ষ ও প্রীতিভরে প্রিয়তম প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে নবপল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন তুমি সেই অনন্তগুণশালিনী শ্রীমতীর ভজনা কর।

৬। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গুহায় প্রচুরতর কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া কপটনিদ্রার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, শ্রীমতী রাধা সেই গুহায় পদার্পণ করিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরাধা গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত। নিদ্রিত রসরাজকে দেখিয়া রমণীর হৃদয়ে রসের উৎস উথলিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে শ্যামসুন্দরের নিকটে গেলেন। সরলা ব্রজবালা মনে করিলেন, "আজ চতুরচূড়ামণিকে একটুকু অপ্রতিভ করিয়া ছাড়িব," এই ভাবিয়া প্রথমতঃ মুরলীধরের হস্ত হইতে তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন মুরলীটিকে অতি ধীরে ধীরে খুলিয়া লইলেন। শ্যামসুন্দর তখনও জাগিলেন না দেখিয়া শ্রীরাধার সাহস বাড়িয়া উঠিল। শ্রীমতীর মনে হইল "কেবল মুরলী কেন, শঠশিরোমণিকে যেরূপ বিভোর নিদ্রায় নিদ্রিত দেখিতেছি, ইহাতে গলার মালাছড়াকেও অনায়াসে সরাইতে পারিব," এই ভাবিয়া যেমন মালাছড়া তুলিয়া লইতেছিলেন, ধূর্ত্তবন্ধুর অমনি সহসা নিজের দক্ষিণ হস্তখানি শ্রীরাধার বক্ষের নিকট অর্পণ করা মাত্রই শ্রীরাধা ভয়ে পলায়নোন্মুখী হইয়া দ্রুত হস্তে নিজের কুচযুগল নিজের আয়ত্তীভূত করিয়া লইলেন। হে মন, এতাদৃশী অনন্ত রসশালিনী শ্রীরাধার ভজনা কর।

৭। শ্যামসুন্দর গোসমূহকে অগ্রে করিয়া সখাদের সহ ব্রজে যাইতে যাইতে চঞ্চল যুবতীবৃন্দের অভিলষিত নয়ননটনে শ্রীরাধার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন. এই সময়ে শ্রীরাধার মোহন কটাক্ষে শ্যামসুন্দরের হৃদয় বিদ্ধ হইয়া পড়িল, তাঁহার হৃদয় প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীরাধার এই সৌভাগ্য দর্শন করিয়া, চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার হৃদয় পরিমৃদিত কমলের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল। হে মন, তুমি এতাদৃশী শ্রীরাধার ভজনা কর।

৮। উজ্জ্বল রসময় রাসলীলাতেও রাসনায়িকা গোপীদের শোভা সততই সমুজ্জ্বলভাবে বর্তমান থাকে। কিন্তু যাঁহার প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বল কান্তিচ্ছটায় তাদৃশ গোপবনিতারূপ অসংখ্য তারকা পরিম্লান বলি প্রতিভাত হয়েন, যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ বরেণ্য ও ধন্য গগনে অম্বরাবাকে শ্রীগোবিন্দরূপ চন্দ্রের সহিত বিরাজিতা, হে মন, তুমি সেই শ্রীরাধার ভজনা কর।

৯। যে কৃতী ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে কাতর-ভাবে, গদ্‌গদ্‌স্বরে, অর্থবোধকভাবে ও স্পষ্টরূপে এই নবাষ্টক পাঠ করেন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ দেবর্বিলাসিত শ্রীরাধারূপ অমৃতলতাতে সেবারস সেচন করিতে সমর্থ হয়েন।

জ্যৈষ্ঠে মাসি শুভে শাকে বসু-পক্ষ গজেন্দ্রকে।
ভাগীরথী-তটে রম্যে গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।
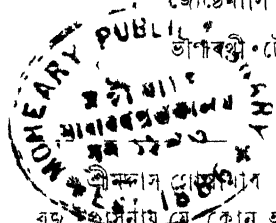
শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর এই স্তবগুলি রাগোপাসনার প্রধানতম প্রার্থনা বলিয়া ইহাতে যে, কোন অশ্লীলভাব থাকিতে পারে না, ইহা যে, প্রেমানন্দময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রসময়ী লীলার পবিত্রতম স্মৃতি—উহা যে আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা হ্লাদিনী শক্তির লীলাবিলাসের অনুধ্যান ব্যতীত কোন প্রাকৃত বর্ণবিন্যাসের পরিচিন্তন নহে, কঠোরতম বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি শ্রীমদ্দাসগোস্বামি কৃত এ সকল স্তবই তাহার অকাট্য প্রমাণ। এতাদৃশ মহাভাগবতগণের চিন্তার সীমান্ত-রেখাতেও অশ্লীলভাবের ছায়াভাস উপনীত হইতে অসমর্থ। সুতরাং সাধারণ পাঠকগণ যদি ভক্তিভাবে এই সকল স্তোত্র পাঠ করিতে না পারেন, তবে যেন একবারেই এ সকল স্থানে দৃষ্টিপাত না করেন, ইহাই এই দীনের বিনীত নিবেদন। শ্রী ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনাও এইরূপ উপাসনা সঙ্কেতেই পরিপূর্ণ।